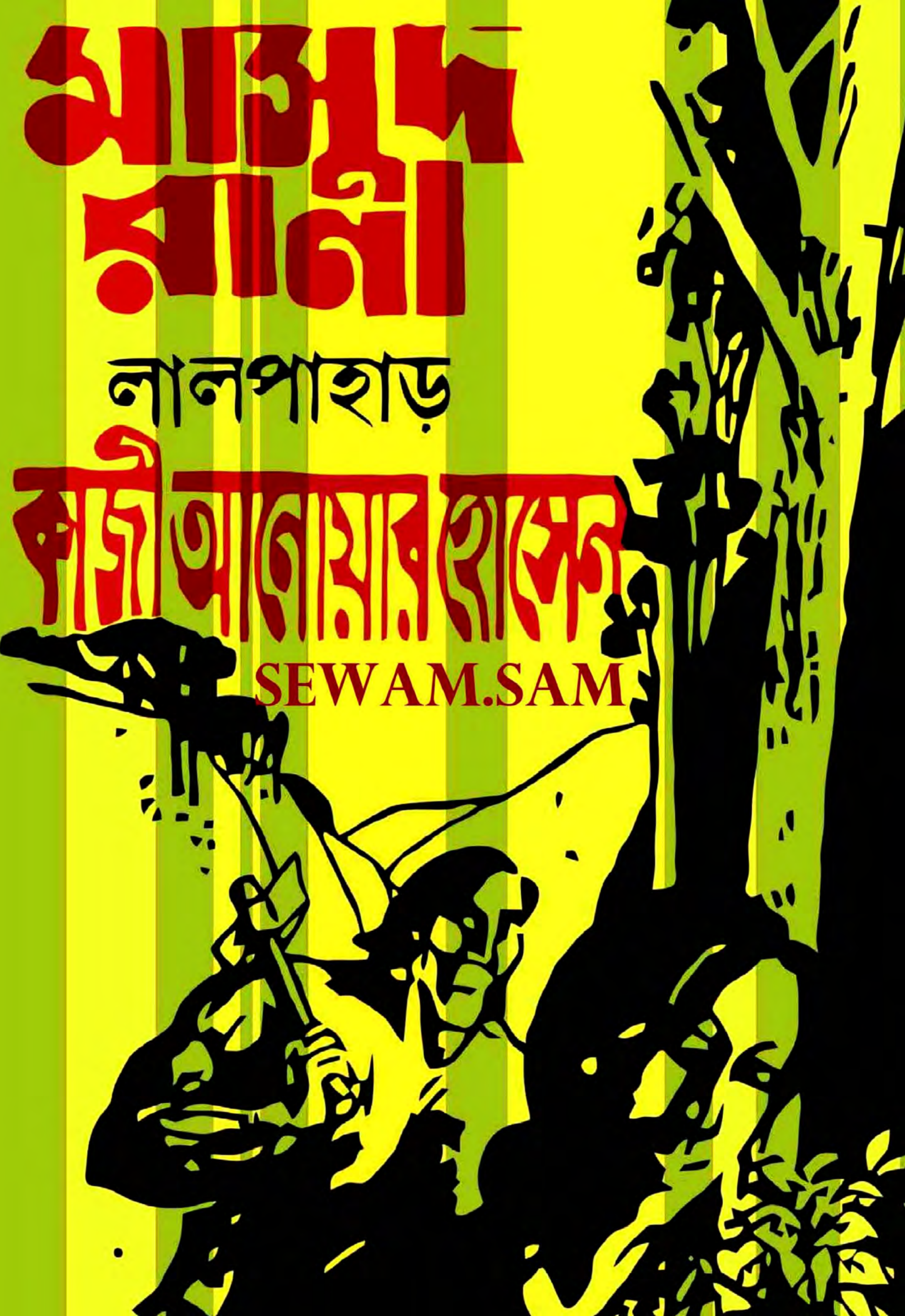

মাসুদ রানা
লালপাহাড়
কাজী আনোয়ার হোসেন
SEWAM.SAM

মাসুদ রানা

লাল পাহাড়

কাজী আনোয়ার হোসেন

মুমূর্ষ এক বৃদ্ধ মরার আগে সাগর দেখতে চেয়েছিলেন।
পিঠে তুলে পৌঁছে দিয়েছিল রানা ওকে সাগর তীরে।
বিনিময়ে ওদের পবিত্র থাম্পা মন্দিরে যাওয়ার নকশা এঁকে
দিল বুড়ো বালির উপর এবং মারা গেল।
কিন্তু চমকে উঠল রানা রাইফেল কক্ করার শব্দে।
চোখ তুলে দেখল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাতজন
অশ্বারোহী।
পৌঁছে গেছে সীমান্তের আতঙ্ক নির্মম দস্যু মিরহাম মার্মা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

লাল পাহাড়

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৭

এক

'গ্না চি লাপে!'

বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল বুড়োটা। অর্থাৎ, বলতে চায়, মারা যাচ্ছে সে, আজই ওর মৃত্যুদিন।

রানা হাঁটছে তো হাঁটছেই। সমুদ্রের দেখা নেই। মাটির পাহাড়ের গা ঘেঁষে কখনও উঁচু কখনও সরু পায়ে চলা পথ। মাথার উপর আকাশ দেখা যায় না। ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে সাগরের দিকে একটানা এগিয়ে চলেছে সে দ্রুতপায়ে—পিঠের উপর মুমূর্ষু বুড়োটা। হাতে রাইফেল, কাঁধে ঝোলানো পানির ফ্লাস্ক।

হিমছড়ির সেই বিখ্যাত জলপ্রপাতটার কাছাকাছিই কোথাও সমুদ্রের ধারে পৌঁছনো যাবে জানে রানা। কিন্তু কতক্ষণে? কাঁধের বোঝাটার ওজন মনে হচ্ছে বেড়ে গেছে দশগুণ। রীতিমত হাঁফাচ্ছে রানা, কুলকুল করে ঘাম নামছে জুলফি বেয়ে। মাঝে মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে চাইছে পেছন দিকে—বাঘটার কথা ভোলেনি সে একমুহূর্তও। সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই আর।

বাঘ মারতেই এসেছিল সে এই দিকটায় আজ।

এক হপ্তার আগে কিছুতেই স্মৃতি ফিরে পেতে রাজি হয়নি শিরিন কাওসার। আসলে শয়তানী। ওর বোন হাস্না কাওসার নিরাপদে বি.সি. আই. হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে আরও কটা দিন স্মৃতিভ্রষ্টার অভিনয় করে রানার সঙ্গ উপভোগ করতে চায় পাজি মেয়েটা। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে তাই কক্সবাজারের খান ভিলা ছেড়ে ওকে নিয়ে চলে এসেছে রানা রামুতে, ডি.আই.জি. আখতারুজ্জামানের বাড়িতে, বাঘ মারার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। পাঁচদিন কেটে গেছে হৈ-হল্লোড় আর গল্প-গুজবে—বাঘের দেখা নেই। হঠাৎ খবর এসেছে আজ সকালে, বাঘ দেখা দিয়েছে। এক জায়গায় নয়—দুই জায়গায়। রামুর উত্তরে মারা পড়েছে একটা ছাগল, হিমছড়ির দিকে মারা পড়েছে একটা গয়াল। জামান শিকার পাগল। আসফ খানও। তিনজন একসঙ্গে ছাগল-মারা বাঘকে ঘায়েল করতে উত্তরে যাবে, স্থির করল জামান। সারাদিন,. দরকার হলে সারারাত মাচার ওপর বসে অপেক্ষা করা হবে।

কিন্তু রাজি হয়নি রানা। মাচায় বসে নিরাপদ শিকারের পক্ষপাতী নয় সে। ওর বক্তব্য: যেহেতু শিকার ব্যাপারটা একটা খেলা, প্রতিপক্ষকেও সুযোগ দিতে হবে প্রতিযোগিতার। বিপদের গন্ধ না থাকলে কি মজা শিকারে? শিকার করতে হয়, মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকার করব। তোমরা যাও উত্তরে, আমি চললাম

হিমছড়ির দিকে।

অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে জামান, কিন্তু টলাতে পারেনি রানাকে। দস্যু সর্দার মিরহামের ভয় দেখিয়েও ফেরানো যায়নি ওকে। চোখ মুখ পাকিয়ে জামান বলেছে, জেনুইন খবর পাওয়া গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বার্মা সীমান্তের আতঙ্ক দস্যু মিরহাম বর্ডার ক্রস করে এদিকে রওনা দিয়েছে—হেসে উড়িয়ে দিয়েছে রানা। অগত্যা মনঃক্ষুণ্ণ জামান আসফ খানকে নিয়ে চলে গেছে উত্তরে, ও বেরিয়ে পড়েছে হিমছড়ির পথে। সাথে গুণ্ডা—রানার প্রিয় ব্লাড হাউন্ড।

মাইল সাতেক এগিয়ে আধ খাওয়া গয়ালের দেখা পাওয়া গেল। গুণ্ডাই দেখাল। কাছে পিঠেই রয়েছে বাঘটা, আন্দাজ করল রানা। হয়তো ভরপেট খেয়ে ঘুমোচ্ছে কোন ঝোপের মধ্যে। আবার খিদে পেলেই বাকি অর্ধেক সাবাড় করে চলে যাবে নতুন শিকারের খোঁজে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাত্তা পাওয়া গেল না বাঘটার। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। জঙ্গলটা দ্রুত আঁধার হয়ে আসবে এইবার। ঘরে ফিরবার তাগিদ অনুভব করল রানা। রাতটা একা এই জঙ্গলে কাটাবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে রাত কাটানোর চাইতে শিরিনের বাহুডোর অনেক সুখের।

মরা গয়ালটার কাছে ফিরে এসেই ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল রানার। খোঁজাখুঁজির ফাঁকে বাঘটা কখন এসে গয়ালের আরও কিছুটা অংশ খেয়ে গেছে টেরই পায়নি সে। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে একটা ঘন ঝোপের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো রানার। ঠিক সেই সময়ে দুলে উঠল ঝোপটা।

মুহূর্তে রাইফেলটা কাঁধে তুলে তৈরি হয়ে গেল রানা। বুড়ো-আঙুল দিয়ে অফ্ করে দিল সেফটি-ক্যাচ। তর্জনী ট্রিগারে। ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা মাথা। ট্রিগারে চাপ দিতে গিয়েই ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। মানুষ! মানুষের মাথা!

হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল বুড়োটা। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। দুই গালে জলের ধারা। দৌড়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। গ্না চি লাপে—বলেই জ্ঞান হারাল বুড়ো।

চোখেমুখে পানির ছিটে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরিয়ে আনল রানা বুড়োর। জ্ঞান ফিরতেই 'রী রী' বলে সামনের দিকে আঙুল দেখাল বুড়ো। মার্মা ভাষায় রী মানে পানি, তাই পানি খেতে দিল রানা ওকে। খেলো না। আঙুল তুলে পশ্চিম দিকে দেখাল। পিঠে তুলে নিল রানা বুড়োকে। বুঝতে পেরেছে—সাগর দেখতে চায় বুড়ো মৃত্যুর আগে। কোথায় যেন শুনেছিল বা পড়েছিল, কোন কোন পাহাড়ী মার্মা গোত্র-প্রধানদের মৃত্যুর আগে সাগর-দর্শনের বিধান আছে।

কিন্তু কোথায় সাগর? জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে রানার।

---

* 'বার্মা' বর্তমান মায়ানমার।

হঠাৎ একটা ঝোপ পেরোতেই সাগর দেখতে পেল রানা। শুকনো বালি ডিঙিয়ে চলে এল সে একেবারে সমুদ্রের কিনারে। হুড়মুড় করে ঢেউ এসে পড়ছে বালুকাবেলায়। মাথায় সাদা ফেনা। জোয়ার আসছে। ঢেউয়ের সঙ্গে তীরে উঠে আসছে হরেক রকম ঝিনুক, শামুক, বিচিত্র আকৃতির পাথর, আর কুৎসিত থকথকে জেলিফিশ।

পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে সূর্য। রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে ধীরে ধীরে নিচু হলো রানা, সাবধানে পিঠ থেকে নামিয়ে বালির উপর শুইয়ে দিল অস্থি চর্মসার বুড়োকে।

চোখ বুজে ককিয়ে উঠল বুড়ো। হাঁপাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে সাগরের জলে ভিজিয়ে আনল রানা, তারপর ভিজে রুমাল দিয়ে সযত্নে মুছে দিল বুড়োর মুখ, কপাল, ঘাড়।

আরে! বুড়ো হাসছে!

'চোখ মেলো,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'কেমন বোধ করছ এখন?'

চোখ মেলে চাইল লোকটা। কথা বলতে গিয়ে কেশে উঠল খক্ খক্ করে। সামলে নিয়ে নিজের ভাষায় যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, 'তুমি বাঙালী, খুব ভাল মানুষ।' তারপর রানার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইল সাগরের অথৈ পানির দিকে।

বুড়ো মগ মারা যাবে, সন্দেহ নেই। ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে বুকের ভিতর। শ্বাস কষ্ট বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। শেষ হয়ে এসেছে লোকটার আয়ু। অদ্ভুত একটা বেদনা বোধ করল রানা বুকের মধ্যে। মরতে হয়। সময় এলে মরতেই হয় সবাইকে।

কিন্তু কখন মারা যাবে লোকটা? এখনই, না দু'ঘণ্টা পর? খানিক বাদেই অস্ত যাবে সূর্য। সন্ধে, তারপর নামবে রাত। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওকে? একা এই সাগর তীরে ওকে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কি করা উচিত এখন?

এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে একজন মানুষ। আরেকজন, যে এখানে থাকবে আরও কিছুদিন, কি করতে পারে তার জন্যে? সহানুভূতি আর সমবেদনা জানানো ছাড়া করবার আছেই বা কি?

হিপ-পকেট থেকে ব্র্যান্ডির শিশিটা বের করে দুই ঢোক ব্র্যান্ডি খাওয়াল রানা লোকটাকে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টি বোলাল লোকটা রানার মুখের ওপর। তারপর বলল, 'আমাকে উঠিয়ে বসাও তো, বাবা?'

চেয়ে রইল রানা। বেশ তো শুয়ে আছে, বসতে চাইছে কেন আবার?

'শুনছ, বাবা!' বুড়োর কণ্ঠে অস্থিরতা।

ধরে বসিয়ে দিল রানা। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলছে বুড়ো। গোনা-গুনতি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্বাস অবশিষ্ট আছে যেন, সাবধানে খরচ করছে।

'তোমার নামটা কি, বাবা?'

'রানা।'

ন্যাড়া মাথাটা এদিক ওদিক দোলাল বুড়ো, 'রানা—খুব ভাল নাম।'

সাগরের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন ভাবল, তারপর ফিরল আবার রানার দিকে, 'লোভ আছে? টাকার লোভ? লালপাহাড়ের লোভ? তাইত মিরত টঙ্কা চাও?' তাইত মানে এক, মিরত মানে নদী—এক নদী টাকা। মানে?

'না।' বলল রানা, 'লোভ নেই। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন করছ?'

'ফুল ভালবাসো? তুমি গান গাইতে পারো?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো আবার। যেন রানার প্রশ্ন শুনতেই পায়নি।

মৃদু হেসে রানা বলল, 'ফুল ভালবাসি। কিন্তু গান গাইতে পারি না।'

'প্রেম করেছ?'

হেসে ফেলল রানা, 'করেছি।'

বুড়ো কিন্তু হাসছে না। বলল, 'তুমি কি জানো, বাবা, রড়িরা ঋণ রেখে মরতে চায় না?'

'শুনেছি।'

বুড়ো বলল, 'তুমি আমার জন্যে এত করলে, আমিও তোমার জন্যে কিছু করতে চাই। তোমাকে…'

রানা বাধা দিল, 'নিজেকে তুমি ঋণী মনে করছ নাকি? তোমার জন্যে কিছুই তো করিনি।'

'তোমরা বাঙালীরা কত না ভাল। তোমাদের বুড়োরা যখন মারা যায়, তোমরা তাদের কত যত্ন করো।' বুড়োর শ্বাসকষ্ট শুরু হলো আবার। শুইয়ে দিল রানা। ব্র্যান্ডি খাওয়াল আরও দু'ঢোক।

একটু চাঙ্গা হয়ে বুড়ো বলল, 'থাদুত্তুয়াং-এর কিরা, মিথ্যে কথা বলবে না—থাম্পা মন্দিরের কথা শুনেছ তুমি, বাবা? লালপাহাড়ের কথা?'

থাদুত্তুয়াং, মগদের ধর্মগ্রন্থ। অসকার শেফিল্ডের লেখা দ্য রেড হিল-এর কথা মনে পড়ল রানার। মাত্র ক'দিন আগেই বইটা পড়া শেষ করেছে ও। পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি কাহিনী। তাতে আছে থাম্পা মন্দিরের কথা।

মাথা উঁচু করে দেখছে বুড়ো রানাকে।

'তুমি তোমাদের প্যাগোডা, যেখানে নরবলি দেয়া হত, সেই মন্দিরের কথা বলছ তো?'

'এক ইংরেজ গিয়েছিল যে মন্দিরে, সেই মন্দিরের কথা বলছি। সেটা আমাদের সমাজ-প্রধান শামানের আমলে…'

'হ্যাঁ শুনেছি। তুমি মর্গানের কথা বলছ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' বুড়ো বলল, 'জানো তাহলে?'

'পার্বত্য চট্টগ্রামের আশেপাশে এমন কেউ আছে, যে জানে না গল্পটা? সবাই জানে। কিন্তু কেউ জানে না সত্যিই থাম্পা মন্দিরের অস্তিত্ব আছে কিনা। সেই মন্দিরে রুবি আছে কিনা। সেখানে পৌঁছুনো যায়, এমন কোন পথ সত্যিই আছে কিনা। সুতরাং, ওসব কথা থাক। এখন তুমি কেমন বোধ করছ তাই বলো।'

লালচে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল বুড়ো, 'এই দেশ আমার বড় প্রিয়, বাবা। এর মায়া ছেড়ে আমি যাচ্ছি… দুঃখ লাগে মনে।' শুয়ে

পড়ল বালির উপর।

রানা অভয় দিল, 'ভয়ের কিছু নেই। কেউ তো চিরদিন বাঁচতে আসে না। সময় হলে আমরা সবাই চলে যাব।'

'ঠিক।' বুড়ো বলল, 'জ্ঞানের কথা।'

সাগরের জলে আবার রুমালটা ভিজিয়ে আনল রানা। ভিজে রুমাল দিয়ে মুছে দিতে লাগল ন্যাড়া মাথা, ঘাড়, কপাল, গাল।

'কারণ পাই না।' হঠাৎ বলল বুড়ো।

'কিসের কারণ পাও না?'

'আমি মার্মা। তুমি আমার কেউ না, চেনো না। কেন? এত কেন মায়া তোমার আমার জন্যে? রানা, এটা কি তোমাদের ধর্ম? তোমাদের নীতি?'

'হ্যাঁ।' রানা বলল, 'সব মানুষেরই এই ধর্ম, এই নীতি।'

সাগরের দিকে তাকাল বুড়ো, খানিক পর আবার রানার দিকে। বলল, 'প্যা হউ পো লা?'

চেয়ে রইল রানা।

'বুঝলে না? জিজ্ঞেস করছি, ফুল নেবে?'

'ওহ্, ফুল দিতে চাইছ? কিন্তু এখানে তুমি ফুল পাবে কোথায়?'

মুচকি একটু হাসল কি হাসল না বুড়ো, ঘাড় না ফিরিয়ে, রানার চোখে চোখ রেখে, হাতটা ঘুরিয়ে প্রায় পেছন দিকটা দেখাল, 'ওদিকে দ্যাখো।'

তাকাল রানা। আরে তাই তো! ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট দূরে খানিকটা জায়গায় ঝোপ ঝাড় মত রয়েছে, আর তার সঙ্গে বুনো একটা ফুল গাছ।

'বসাও, বাবা!' অনুরোধ করল বুড়ো।

রানা আবার উঠিয়ে বসাল তাকে।

'ফুল নিয়ে এসো। ডাল ভেঙে আনতে হবে, পারবে তো?'

'পারব।' বলল বটে রানা, কিন্তু নড়ার লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে।

'যাও!' বুড়ো বলল, 'সময় ফুরিয়ে যায় যে!'

উঠে দাঁড়াল রানা। এগোল।

লম্বা, সরু কাঠির মত গাছটা। মাথায় কয়েকটা ডালপালা। ফুলগুলো লাল, নক্ষত্রের মত দেখতে। শিকড়সহ তুলে নিয়ে ফিরে এল রানা। বলল, 'তোমার নাম জানা হয়নি এখনও। নামটা বলো। তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠি কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, তোমার কথা বলব তাদেরকে।'

ঘন ঘন মাথা দোলাল বুড়ো, 'লাভ কি! তারা আমার জন্যে দুঃখ পায় না। তারা আমাকে ভালবাসে না। আমাদের বুড়োদের···কেউ নেই।'

কিছু বলার নেই।

'রড়ি আঁফা নাম আমার।' বুড়ো আবার বলল, 'বাবা, এইবার সূর্য ডুববে।'

'হ্যাঁ। ঠাণ্ডা বাতাস দেবে এবার। ভালই হবে তোমার জন্যে, হয়তো সামলে নিতে পারবে এ যাত্রা।'

'দেখো, আমি কি নকশা আঁকি।' রানার হাত থেকে ফুল গাছটা নিল

বুড়ো।

'নকশা?' রানা অবাক, 'কিসের নকশা?'

'মন দিয়ে শোনো, বাবা,' বুড়ো বলল, 'থাম্পা মন্দিরের নকশা আঁকছি আমি। বুকে গেঁথে নেবে, কেমন?' বুড়ো রানার একটা হাত ধরে ফেলল, তাল সামলাল কোনরকমে, 'আমাকে ধরে রাখো পেছন থেকে। আঁকাবাঁকা হয়ে যাবে তা না হলে।'

নড়ল না রানা। বলল, 'পাগল হয়েছ তুমি! কে বলেছে তোমাকে নকশা আঁকার কথা? কোন দরকার নেই। তুমি বুঝি ভাবছ, তোমাকে ফেলে পালাব, তাই···?'

বুড়ো বাধা দিয়ে বলল, 'মানুষ চিনতে ভুল হয় না আমার, বাবা।' নিজের বুক চেপে ধরল। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল মুখ, কাশতে শুরু করল খক্ খক্ করে। 'জানি, পালাবে না। নকশাটা তোমাকে এঁকে দেখাব, কারণ, তোমার ঋণ আমি শোধ করে যাব। তোমাকে ভাল লেগেছে আমার। ভাল মানুষ পাইনি, তাই এই নকশার হদিশ সাগরকে জানাতে এসেছিলাম। তোমাকে পেয়েছি, তাই তোমাকে জানাব। আমি চাই, তুমি সেখানে, সেই লালপাহাড়ে যাবে। জানতে চাও, লাল পাথর আছে, কি নেই?' চোখ বুজে মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'আছে।' চোখ মেলল পরক্ষণেই। 'হাজারো আছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, বাবা, আগে থাদুত্তুয়াং-এর কিরা খাও। বলো, দেবতার তৃতীয় নয়নটা নেবে না, ছোঁবে না তুমি?'

বইয়ে পড়েছে রানা, থাম্পা মন্দিরের ভিতর বিগ্রহের কপালে একটা প্রকাণ্ড পাথর আছে। সেটাও চুনি। মগদের বিশ্বাস, পাথরটা যার কাছে থাকবে, মরবে না সে, অমরত্ব লাভ করবে। বুঝল, মরার আগে প্রলাপ বকছে বুড়ো।

'নকশা লাগবে না আমার,' রানা বলল, 'তোমাকে একটু আরাম দিতে পেরেছি, তাতেই আমি খুশি। তুমি শোও তো···।'

'থাদুত্তুয়াং-এর কিরা খেতে হবে তোমাকে।' অবশ, দুর্বল ডান হাতটা কাঁপছে বুড়োর, সেই হাত রাখল বালির ওপর, তারপর একদিক থেকে আর একদিকে টেনে নিয়ে গেল। এমনি ভাবে কয়েকবার। বালি সমান করে ফুল গাছটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ইশারায় বলল ডালপালাগুলো ছিঁড়ে দিতে।

সরু কাঠির মত করে ফিরিয়ে দিল রানা গাছের কাণ্ডটা। বুড়োকে ধরল এক হাত দিয়ে। বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল বুড়ো। আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থা। সমতল বালির ওপর রেখা আঁকছে। দুর্বল, কাঁপা কিন্তু দক্ষ হাতে।

আশ্চর্য ব্যাপার। লালচে বালির ওপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পাহাড়, গিরিপথ, পায়ে হাঁটা পথ, ঝর্ণা, উপত্যকা, বনভূমি সব নিখুঁতভাবে এঁকে ফেলল বুড়ো।

'কিরা খাও।' বুড়ো মুখ তুলল। লাল হয়ে গেছে চোখ দুটো, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, হাঁপাচ্ছে আবার, 'বলো, তৃতীয় নয়ন নেব না।' রানা দেখল, একে শান্ত করবার একমাত্র পথ হচ্ছে এ যা বলে তাই করা।

'থাদুত্তুয়াং-এর কিরা, তৃতীয় নয়ন নেব না।'

মাড়ি বের করে হাসল বুড়ো, পরমুহূর্তে কাজে মন দিল। গোল একটা দাগের ওপর কাঠির আগা রেখে বলল, 'এই হলো অলিকদাম। এখান থেকে কখনও ডানে, কখনও বাঁয়ে যাবে। চারটংশে…মানে, চল্লিশ মাইল আঁকাবাঁকা পথ।'

'বার্মা সীমান্ত তাই না?'

'ভারত আর বার্মা সীমান্তের কাছেপিঠে…'

'সীমান্ত পেরিয়ে যেতে হবে?'

প্রশ্নটার উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বুড়ো বলল, 'এই যে, এইখানে দেখো, দুই মিনারের মত দেখতে পাহাড়ের চূড়া…। বুকে এঁকে নাও, বাবা। অলিকদাম থেকে শুধুমাত্র একটা জায়গায় দাঁড়ালে এই মিনার দুটো দেখতে পাবে। কাজের জিনিস এটা। মনে থাকবে?'

'থাকবে।' বৃথা সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে বিরক্ত লাগছে রানার। ভীমরতি ধরেছে বুড়োকে। থাম্পা মন্দিরের মানচিত্র, মানে মরীচিকা। অসকার শেফিল্ডের বইয়ে এগারোটা এই রকম ম্যাপ ছাপা আছে। মর্গান চারটে ম্যাপের সাহায্যে চেষ্টা করেছিল লালপাহাড়ে দ্বিতীয়বার পৌঁছুতে। সফলতা আসেনি। খুঁজে পায়নি সে সেই সরু গিরিপথটা। জামানের কাছেও এইরকম ম্যাপ দেখেছে রানা। ওর ধারণা, এবং সেটাই যদ্দূর সম্ভব সত্যি, কোন ম্যাপই নিখুঁত নয়, আসল পথের সন্ধান কোন ম্যাপেই নেই। বুড়ো যেটা আঁকছে, এটাও অন্যান্যগুলোর মত দেখতে। দু'এক জায়গায় একটু আধটু পার্থক্য আছে বটে কিন্তু সে তো থাকবেই। এর আগে বারোটা ম্যাপ দেখেছে ও, একটার সঙ্গে আর একটার মিলও আছে, অমিলও আছে।

মোট কথা, উৎসাহ বোধ করছে না রানা। মুমূর্ষু মানুষটার আন্তরিক ইচ্ছেটা হৃদয়স্পর্শী, কিন্তু মানচিত্রটা যে একটা ধাঁধা এবং ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয় তা হয়তো এই বুড়ো নিজেও জানে না।

'নিজে কখনও গেছ সেখানে? ওই থাম্পা মন্দিরে?'

মাথা নাড়ল বুড়ো, 'না। রড়ি শামান গিয়েছিল। পঁয়ত্রিশ বছর আগে।' নকশাটা মুছতে গিয়েও মুছল না, 'দেখে নাও, লিখে নাও মনের পর্দায়।'

'ঠিক আছে।' নকশার দিকে চোখ রেখে বলল রানা।

মুছে ফেলল বুড়ো নকশাটা, 'এবার আর একটা আঁকব। প্রথমটা ছাড়া দ্বিতীয়টা দেখে কেউ কিছু বুঝবে না, আর দ্বিতীয়টা ছাড়া প্রথমটার মূল্য নেই। এইটা আসল জিনিস। দুই মিনারের মত পাহাড়ের চুড়োর কাছ থেকে তিনদিনের দুর্গম পথ। বিশদ এঁকে দিচ্ছি আমি। এটা হচ্ছে পবিত্র মন্দিরে ঢোকার পথের নকশা। এই পথটাই ইংরেজ মর্গান হারিয়ে ফেলেছিল।'

দ্বিতীয় নকশাটা আঁকতে শুরু করল বুড়ো। খুব ধীর গতিতে, থেমে থেমে, চিন্তাভাবনা করে কাজ করছে।

সূর্য ডুবডুবু। ঠাণ্ডা, ভারী বাতাস ঝাপটা মারছে। বালুকাবেলার এদিক ওদিক কোথাও জনপ্রাণীর ছায়া পর্যন্ত নেই।

মিনিট তিনেক পর নকশাটা শেষ করল বুড়ো, কাঠিটা রাখল এক জায়গায়,

'এই যে সরু গিরিপথের মুখগুলো এখানে মিশেছে। এইখানে একটা রহস্য আছে, বাবা। সে রহস্যের কথা তোমাকে আমি ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারছি না।'

'কেন?'

'তুমি মার্মা নও। তোমাকে সব বলতে পারি, শুধু একটা রহস্য বলতে পারি না। এখানে তোমাকে বুদ্ধি খাটাতে হবে। তুমি বুদ্ধিমান, দেবতা তোমার সহায়, বুদ্ধি খাটিয়ে রহস্যটা জেনে নিতে পারবে তুমি। ভাল কথা, কোন মগকে সঙ্গে নিয়ে তুমি ওখানে যেয়ো না।'

'কেন?'

'থাম্পা মন্দিরে সাচ্চা মগ ছাড়া অন্য কারও যাওয়া নিষেধ, কেউ গেলে, মগেরা তাকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দেয় না। এখন শোনো, মন দিয়ে শোনো।'

মুখস্থ করা জ্ঞানটুকু বিতরণ করে চলল বুড়ো। দ্বিতীয় নকশার কোন্‌টা কি, তার ব্যাখ্যা।

অধৈর্য হয়ে উঠল রানা একসময়। নকশার তাৎপর্য ব্যাখ্যা শেষ করে বুড়ো প্রলাপ বকতে শুরু করায় জোর করে শুইয়ে দিল রানা তাকে।

'উঠতে চেষ্টা কোরো না।' বুড়োর বুকে বাঁ হাত চেপে রেখে বলল রানা, 'মুখটা মুছে দিই, ঘেমে তো নাস্তানাবুদ হয়ে গেছ।'

আবার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে বুড়োর। সময় ঘনিয়ে এসেছে, বুঝতে পারছে রানা। আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। চোখের দিকে তাকানো যায় না, আতঙ্ক ভরা দৃষ্টি। টের পাচ্ছে নিজেই, দীপ নিভু নিভু।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'তোমার আত্মীয়-স্বজন কাউকে কোন খবর দিতে হবে?'

'না।' অস্ফুটে বলল, 'তারা আমার জন্যে ব্যথা পাবে না।'

'খুব কি কষ্ট হচ্ছে? কি করলে আরাম পাবে বলো আমাকে।' রানা বুড়োর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল। বুড়ো চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। চোখে এখন আর আতঙ্ক নেই।

'বিশ্বাস হয় না?' বলল বুড়ো, 'তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি আমি।'

লজ্জা পেল রানা। অপরাধী মনে হলো নিজেকে। ধরা পড়ে গেছে ও। সত্যি কথা বলাই স্থির করল।

'না। বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করো না লালপাহাড়ের কথা?'

মাথা নাড়ল রানা, 'না, করি না। এই এলাকায় রুবি মন্দিরের হাজার রকম গল্প শোনা যায়। কোন্‌টা বিশ্বাস করব?'

'ঠিক। হাজার গল্প আছে। কিন্তু লাল মন্দির হাজারটা নয়, একটাই। তাই নকশাও একটাই।'

রানার চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন না দেখে অস্থির হয়ে উঠল বুড়ো। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'কি করে বোঝাই, বাবা। আচ্ছা, জবাব দাও—

আমি মরতে যাচ্ছি। হাচা?'

'হাচা।'

'মরার আগে কিছু দিতে চাই তোমাকে। হাচা?'

'হাচা।'

'তাহলে কেন ভুল নকশা দেব? কি লাভ তাতে আমার?'

কথাটা যুক্তিযুক্ত ঠেকল রানার কাছে। তবু বুড়োর কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না ওর কিছুতেই।

'শুনেছি এক ওঝার কাছে আসল নকশাটা ছিল। কিন্তু সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে...'

'সেই ওঝা আমার ভাই ছিল, রড়ি শামান ছিল তার নাম। সেই দিয়ে গেছে আমাকে এই নকশা...'

'তাই নাকি!' হৃৎপিণ্ডটা আচমকা লাফিয়ে উঠল রানার, 'শামান মানে ওঝা, তাই তো! তার মানে...'

'হ্যাঁ।'

চেয়ে রইল রানা বুড়োর দিকে। কথা সরল না মুখে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আচ্ছা...' থামল, ঝুঁকে পড়ে দেখল। নিঃসাড় হয়ে গেছে লোকটা। চোখ দুটো খোলাই রয়েছে, স্থির হয়ে গেছে শুধু মণি দুটো। আঙুলের মৃদু স্পর্শ দিয়ে চোখের পাতা দুটো নামিয়ে দিল রানা। বলল, 'গো উইথ গড, ওল্ড ম্যান!'

উঠতে যাবে রানা, সামনে থেকে রাইফেল কক্ করার শব্দ হলো। একটা, তারপর আর একটা, তার সঙ্গেই পরপর আরও দুটো তিনটে।

বিপদ! মাথা তুললেই দেখতে পাবে ও।

পাথরের ওপর ছোরা ঘষল কেউ যেন, কণ্ঠস্বরটা এমনই কর্কশ। মিরহাম মার্মা, কার যেন নাম? চোখ না তুলে দ্রুত ভাবছে রানা। কার নাম মনে পড়ছে না? কিন্তু নামটার সঙ্গে তাৎক্ষণিক একটা বিপদ আছে, বুঝতে পারছে ও।

পিঠে একটা শীতল স্রোত, উঠে আসছে ওপর দিকে, অনুভব করল ও। বর্মী দস্যু, বুকে যার হৃদয় নেই বলে কিংবদন্তী আছে...

দুহাত মাথার ওপর তুলতে তুলতে ভাবল রানা, শেষ! গুড বাই, পৃথিবী! গুলি করার আগে নিজের নামটা ঘোষণা করে মিরহাম মার্মা। গুলি করে তারপরই।

দুই

চারটে রাইফেলের ব্যারেল, রানার বুকের দিকে তাক করে ধরা। সাতটা ঘোড়ার ওপর বসে আছে ভয়াল দর্শন সাতজন ঘোড়সওয়ার।

একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকাল রানা।

কেউ নড়ছে না। ঘোড়াগুলোও স্থির। মাঝখানের লোকটার মুখ প্রায় সমতল, থালার মত। অনুমান করল রানা, এই-ই মিরহাম মার্মা। চেহারার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে হুবহু। পাঙ্খো এবং ম্রা উপজাতির রক্ত বইছে ওর শরীরে। লম্বায় বড় জোর সাড়ে পাঁচ ফিট হবে, চোখ দুটো বড় বড়, বিস্ফারিত ভাব রয়েছে একটু, মুখটা দাড়ি গোঁফহীন। তার ডান দিকে···সর্বনাশ!

প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মত দেখতে লোকটা। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া—কিন্তু মেদের চিহ্ন নেই শরীরের কোথাও। মুখটা হুবহু ঘোড়ার মত। দানবের কাঁধে ঘোড়ার মুণ্ডু কেটে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। লোকটার হাতে একটা বর্মী কুঠার। হাতখানেক লম্বা কাঠের হাতল, ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা। নির্বিকার চেয়ে আছে রানার দিকে। দু'চোখে ভালমানুষের দৃষ্টি।

মিরহামের বাঁ দিকে আর এক বিস্ময়। সাক্ষাৎ গরিলা। মাথায় বাবরি, লোমশ শরীর। শরীরের সর্বত্র চড়াই উৎরাই, ফুলে ফুলে আছে শক্ত পেশীগুলো। লোকটা বেঁটে খাটো, হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা। পা দুটো ধনুকের মত বাঁকা। এই লোকের শরীরে অসুরের শক্তি আছে, মেনে নিল রানা পরীক্ষা ছাড়াই।

ঘোড়া-মুখো দৈত্যের পাশের ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে আর কারও তুলনা হয় না। পিঠ সোজা করে, বুকে হাত দুটো ভাঁজ করে মাথাটা একটু কাত করে চেয়ে আছে সে। লোকটার মধ্যে আভিজাত্যের লক্ষণ পরিষ্কার। সাদা এক খণ্ড সারং পরনে, ঊর্ধ্বাঙ্গেও চাদর জড়ানো, সেটাও সুতী নয়, সিল্ক। ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়ানো চুল, ভরাট চারকোনা ধরনের মুখ, গর্বিত ভাবভঙ্গি, চোখে শাণিত দৃষ্টি। চওড়া কপাল, নাকটা অপেক্ষাকৃত খাড়া। মুখের চেহারায় বুদ্ধির ছটা।

তার পাশের ঘোড়সওয়ার অস্বাভাবিক গম্ভীর। বাঁ চোখটা নেই, গর্তটা বীভৎস। রাইফেলটা ধরে আছে খেলনা ধরার ভঙ্গিতে, এক হাতে। নীচ ও নিষ্ঠুর, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। সাজগোজের বালাই নেই, কৌপিন মত একটা রয়েছে কোমরে, বাকি শরীর অনাবৃত।

মিরহামের বাঁ দিকে, গরিলার পাশে যে লোকটা রাইফেল উঁচিয়ে চোখ দুটো ছোট ছোট করে রানার বুকের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির রেখেছে সারাক্ষণ, তার পরনেও কোমরবন্ধ ছাড়া কিছু নেই। এই লোকটার শরীরে এমন এক ইঞ্চি জায়গাও নেই যেখানে ক্ষতচিহ্ন দেখা না যাচ্ছে। ছোট বড় সব মিলিয়ে কয়েকশো ক্ষতচিহ্ন লোকটার শরীরে। পুরানো ও শুকনো ক্ষত, কিন্তু কুৎসিত—চোখ আটকে যায়। লোকটার ঠোঁটের আধ-ইঞ্চি নিচে দগদগে ঘা। মাঝে মাঝে চেটে নিচ্ছে জিভ বের করে।

তার পাশের লোকটা দলের মধ্যে সবচেয়ে চিকন। কাঠির মত লোকটার হাতে তামার বালা রয়েছে। গলায় মালা। ন্যাড়া মাথা, নাকের ডগায় একটা লাল জড়ুল, জোড়া ভুরু। তার নির্বিকার ভাবটা অস্বস্তিকর ঠেকল রানার কাছে।

মিরহামের দিকে আবার তাকাল রানা, 'তুমিই মিরহাম···?'

পাল্টা প্রশ্ন এল। 'তুমি কে?'
'শিকারী।' বলল রানা, 'শিকারে এসেছিলাম। তোমরা কি চাও?'
লাশের দিকে আঙুল তুলল মিরহাম, 'ওর সঙ্গে কোথায় দেখা হলো?'
'জঙ্গলে। সাগর দেখতে চেয়েছিল মরার আগে।'
'তুমি এনেছ ওকে এখানে?'
'হ্যা।'
'কিছু বলেছে ও সাগরকে?'
কি জানতে চায়, ওদেরকে দেখেই বুঝে নিয়েছে রানা। উত্তরটা দেবার আগে দ্রুত ভেবে নিল ও। এই উত্তরের ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন মরণ।
'মিছে কথা বলবে না। আমি, মিরহাম মার্মা, সাবধান করে দিচ্ছি।'
সময় নেবার জন্যে রানা বলল, 'শুনেছিলাম তুমি নাম ঘোষণা করেই গুলি করো।'
'করি। তোমাকে করিনি, কারণ আছে।'
'কি কারণ?'
'নকশা চাই?'
'নকশা? কিসের নকশা?'
অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মিরহাম অপ্রত্যাশিতভাবে। ডান হাতটা মাথার ওপর তুলে আঙুলগুলো নাচাল অদ্ভুত ভঙ্গিতে। সাতজন ঘোড়সওয়ার একযোগে, যন্ত্রের মত লাফ দিয়ে নামল ঘোড়া থেকে বালির ওপর।
সামনে এগোল মিরহাম। তার ডান পাশে, একটু পিছনে আসছে প্রকাণ্ড দৈত্যটা। বাঁ পাশে গরিলাসদৃশ অসুর। বাকি চারজন দুই ভাগে ভাগ হয়ে দু'পাশে সরে যাচ্ছে। রানার পেছন দিকে চলে গেল তারা।
দুই দেহরক্ষীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিরহাম রানার আপাদমস্তক দেখল, 'সাগরকে কি বলেছে রড়ি আঁফা?'
'কিছু বলেনি।'
'তোমাকে?'
'আমাকে? আমাকে কি বলবে?'
'তিন কিংবা হয়তো চার পর্যন্ত গুনব আমি, তারপর গুলি করব।'
-হুমকি নয়, ছোবল মারার জন্যেই ফণা তুলেছে। পরিস্থিতিটা দ্রুত ভেবে নিল রানা। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দর কষাকষি করার মত কোন সম্বল নেই ওর। রাইফেলটা মৃতদেহের কাছে, চার পাঁচ হাত বামে। ওয়ালথারটা প্যান্টের ডান পকেটে, বের করার আগেই ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। দ্রুত ভাবছে রানা।
হঠাৎ বুদ্ধিটা এল মাথায়। মিরহামের চোখে চোখ রেখে, একপা সামনে বাড়ল রানা। বলল, 'ঠিক আছে। স্বীকার করছি।'
'স্বীকার করছ? কি স্বীকার করছ?'
'রড়ি আমাকে লালপাহাড় আর থাম্পা মন্দিরের নকশা দিয়ে গেছে।'
চেয়ে রইল মিরহাম। হিংস্র হয়ে উঠছে মুখের চেহারা।
'বিশ্বাস হচ্ছে না?' প্রশ্ন করল রানা।

কথা নেই, শুধু চেয়ে আছে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। কদাকার হয়ে উঠছে সমতল মুখটা। রানা বুঝল, গভীর ভাবে চিন্তা করছে মিরহাম। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে এখুনি। ভরসার কথা, এই লোকটা শুধু দস্যুই নয়, বুদ্ধিমানও।

'এগিয়ে এসো তিনজন। প্রমাণ দেখাচ্ছি।'

গম্ভীর গলায় মিরহাম জানতে চাইল, 'কোথায়?'

'আগে বাড়ো।'

রানার চোখে চোখ মিরহামের, পা বাড়াল সে। তার সাথে সঙ্গী দুজনও।

পাঁচ হাত দূরে থাকতে রানা বলল, 'দাঁড়াও।'

দাঁড়াল তিনজন। সতর্ক। রানা চালাকি করার চেষ্টা করছে, সন্দেহ করছে ওরা। প্রমাণ পেলেই মেরে ফেলবে ওকে।

মিরহামকে দেখছে রানা। পরনে হাত কাটা লাল রঙের সিল্কের কুর্তা। উরুতে এঁটে বসা সাদা হাফপ্যান্ট। কোমরে জড়ানো ছাপা সিল্কের স্কার্ফ—বিখ্যাত জিনিস ওটা। জামানের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এই স্কার্ফটা সংগ্রহ করেছিল মিরহাম এক বিদেশী ট্যুরিস্টের স্ত্রীকে খুন করে। স্কার্ফটার এক জায়গায় একটা পকেট তৈরি করে নিয়েছে সে। সেই পকেটে থাকে রিভলভারটা।

চেয়ে আছে রানার দিকে মিরহামও। খ্যাপা দৃষ্টি। চোখ সরাচ্ছে না রানাও। কার কতটুকু ক্ষমতা মাপছে যেন, বোঝার চেষ্টা করছে।

'কোথায়?' আবার জানতে চাইল মিরহাম।

দুইজনের মধ্যবর্তী জায়গাটা দেখিয়ে দিল রানা আঙুল দিয়ে, 'এই তো।' চেয়েই আছে মিরহাম রানার দিকে। যেন শুনতে পায়নি কথাটা।

অনেকক্ষণ পর চোখ নামাল মিরহাম। বালির দিকে তাকিয়ে রইল ক'সেকেন্ড। তারপর চমকে উঠল। 'আরে! তাই তো!' হুমড়ি খেয়ে পড়ল মিরহাম নকশার ওপর। পনেরো সেকেন্ড সময় দিল রানা, তারপর পা তুলে লাথি মারল বালির ওপর। একবার দু'বার তিনবার...!

নেই হয়ে গেল নকশা!

কাটা ঘুড়ি যেন, নারকেল আর খেজুর গাছের মাথায় আটকে গেছে আধখানা চাঁদ। চারদিকে পাহাড়ী নিস্তব্ধতা। ফিসফিস আলাপ করছে শুধু গাছের পাতারা। দিনের বেলা চাঁদি-ফাটানো গরম গেছে, এখন বইছে ঠাণ্ডা, গা জুড়ানো বাতাস। চারদিকে জ্যোছনার রহস্যময় হাসি।

গাছের গায়ে হেলান দিয়ে, পা দুটো মাটির উপর লম্বা করে বসে আছে রানা। আছে মানে, থাকতে বাধ্য হয়েছে। গাছের সঙ্গে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। বসে আছে, আর চাঁদের গা ঘেঁষে মেঘদের ওড়া দেখছে রানা, বাতাসের ফিসফিসানি শুনছে। দশ হাত দূরে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে আলোচনায় বসেছে দস্যুদল। বিষয়বস্তু: রানাকে খুন করা হবে কি হবে না।

এলোমেলো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে ওরা। মাঝখানে জ্বালা

হয়েছে আগুন। ঘোড়ামুখো দৈত্য সিকুবা আ সবার থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে গিয়ে একধারে বসে আছে। কুঠারটা কোলের ওপর রাখা।

লম্বা, দৃঢ় পায়ে পায়চারি করছে অভিজাত সুপুরুষ চম্মা মং। সিকুবা আ এবং চম্মা মং মার্মা উপজাতির লোক। নির্ভেজাল, খাঁটি রক্ত বইছে ওদের ধমনীতে। চম্মা মং গোত্র প্রধানের ছেলে, পরবর্তী গোত্র প্রধান হবে সে-ই। তার হাঁটা-চলা, কথা বলার ভঙ্গি, চেহারা, বুদ্ধি—সবই সবার থেকে আলাদা। গোত্র প্রধানের বিশেষ নির্দেশে রড়ি আঁফার সন্ধানে মিরহামের দলে যোগ দিয়েছে চম্মা মং। দেহরক্ষী হিসেবে সঙ্গে এসেছে ঘোড়ামুখো দৈত্য—সিকুবা আ।

শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারি করছে চম্মা মং। সাদা সিল্কের চাদরে সুন্দর মানিয়েছে তাকে। প্রিন্সের মত।

দস্যু সর্দার মিরহামের ডান হাত হলো গরিলাসদৃশ চুচ্যাং তাগল। একে নিয়েই রড়ি আঁফার সন্ধানে বেরিয়েছিল সে। পথে দেখা সিকুবা আ আর চম্মা মং-এর সঙ্গে। সাগরের দিকে রওনা হয়েছে খবর পেয়ে তারাও রড়ি আঁফার খোঁজে আসছিল এদিকে। চম্মা মংকে একবিন্দু পছন্দ বা বিশ্বাস করে না মিরহাম। জানে, লোকটাকে কোনদিনই অনুগত ভৃত্যের পর্যায়ে নামানো সম্ভব নয়। কিন্তু সিকুবা আ-কে দরকার হতে পারে মনে করে ওদেরকে দলভুক্ত করে নিয়েছে মিরহাম। সব গোত্রের মধ্যে চুচ্যাং তাগলের বলশক্তির খ্যাতি থাকলেও, সিকুবা আ অদ্বিতীয়। সিকুবা আ-র সঙ্গে চুচ্যাং লাগতেই সাহস পাবে না কোনদিন।

মিরহামের পাশে বসেছে চুচ্যাং। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বাবরি। ফোলা ফোলা পেশী। হাত দুটো দেহের তুলনায় বেশি লম্বা, পাগুলো পাঁজরার হাড়ের মত বাঁকা। চোখ দুটোর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। হিংস্র দৃষ্টি। তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ সর্বক্ষণ ছুতো খুঁজছে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণ করার জন্যে কারও ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার। সেন্দুজ উপজাতির ভয়ঙ্কর-দর্শন এই গরিলার দৃষ্টি পড়েছে আজ রানার ওপর। ঘাড় ফিরিয়ে বারবার দেখে নিচ্ছে সে রানাকে।

অশুভ একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছে রানা লোকটার ব্যবহারে।

শরীরে কয়েকশো ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বসে আছে তারু তাকুন। খুমী উপজাতির গোত্র প্রধানের শ্যালক। জিভ দিয়ে দগদগে ঘা চাটতে চাটতে, থেমে থেমে কথা বলছে সে।

তার পাশে বসেছে দলের সবচেয়ে চিকন সদস্য—গলায় কড়ির মালা, ডান হাতে তামার বালা। নাকের ডগায় লাল জড়ুল, জড়ুলটার ওপরের চামড়া চুলকাচ্ছে ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে। এটা তার একটা বদভ্যাস। বনযোগী উপজাতির প্রতিনিধিত্ব করছে সে, নাম কুতজার।

মুরংদের প্রতিনিধি ওয়াকলাইয়ের বাঁ চোখ নেই। প্রায় উলঙ্গ সে। মুখটা সারাক্ষণ থম থম করছে। স্বার্থ-সচেতন, সুযোগসন্ধানী, হাসতে জানে না।

সবাই এসেছে দূর-দূরান্ত থেকে। সবার লক্ষ্য এক, মিলিত হয়েছে একই উদ্দেশ্যে। প্রত্যেকে চায় লালপাহাড়ের নকশা, থাম্পা মন্দিরে প্রবেশ করতে

পথ-নির্দেশ।

চুচ্যাং যখন কথা বলছে, চুপ হয়ে যাচ্ছে সবাই। তার বক্তব্য, বন্দীকে তো খুন করতেই হবে, শুধু কি পদ্ধতিতে করা হবে সেটাই বিবেচ্য। সবিস্তারে ব্যাখ্যা করছে সে রানার হাতের দশটা আঙুল মটকে ভেঙে, ছোরা দিয়ে চোখের মণি খুঁচিয়ে তুলে প্রশ্ন করতে হবে, মরে গিয়ে ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপবি কি না বল? যতক্ষণ না রানা প্রতিশ্রুতি দেবে যে, সে ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপবে না; ততক্ষণ ওর পিঠের চামড়ায় ব্লেড দিয়ে রেখা টানা হবে লম্বালম্বি ভাবে। প্রতিশ্রুতি দিলে আর কোন অত্যাচার না করে মুক্তি দেয়া হবে রানাকে। গলাটা আলাদা করে ফেলা হবে ধড় থেকে। মাংসগুলো টুকরো টুকরো করে স্তূপীকৃতভাবে সাজিয়ে রেখে দেয়া হবে জঙ্গলে, বনদেবতা খুজিং-এর ভোজ হিসেবে।

'ব্যাটা কসাইয়ের মত কথা বলছে!' মিরহাম বলল, 'এই চুচ্যাং, হয়েছে কি তোর? আমাদের উদ্দেশ্যের খাতিরে খুন খারাবীর কথা ভুলে থাকবি, কথা দিসনি?'

সুদর্শন চম্রা মং পায়চারি থামাল, 'ঠিক। উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হলে অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো বাদ দিতে হবে আমাদের। তুমি কি বলো, সিকুবা আ?'

ভালমানুষের দৃষ্টি দিয়ে তাকাল দূর থেকে সিকুবা আ রান্যার দিকে। হাত বুলোচ্ছে কুঠারের হাতলে। হাসি হাসি মুখ। আসলে হাসছে না দৈত্যটা, মুখের সার্বক্ষণিক চেহারাটা ওর অমনই, মনে হয় হাসছে। বুঝতে পারছে রানা।

'আমি কেউ না, চম্রা মং, তুমি কথা বলো আমার তরফে।' ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠস্বর, শরীরের সঙ্গে চমৎকার মানানসই, 'আমি কি জানি? তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।'

মুরং ওয়াকলাই বিরক্ত গলায় বলল, 'এসব ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।' রানার দিকে কটমট করে তাকাল সে, 'আং লাউ খি এন দ্যাই। তোমাকে ভাল লাগছে না আমার।'

জিভ বের করে ঘা চাটতে চাটতে তারু তাকুন বলল, 'মিরহাম? হিননু আতি মু? এটা কি? তুমি বোবা সেজে আছ কেন? পবিত্র মন্দিরে যাবে কি যাবে না? এক করা টাকার ধন নেবে কি নেবে না? কিছু বলো তুমি, মিরহাম।'

সুযোগটা নিল রানা।

'মিরহাম, সত্যি কিছু বলা দরকার তোমার। বোকার দলকে বলো পবিত্র মন্দিরে যাবার চাবিকাঠি একমাত্র আমার কাছেই আছে। রড়ি আঁফার এঁকে দেয়া নকশার প্রতিটি রেখা গাঁথা রয়েছে আমার মনে।'

চুচ্যাং ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানার দিকে, ফুলে উঠল পেশীগুলো, টেনে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে, 'নকশা এঁকে দেবে কি দেবে না?'

নির্যাতনের জন্যে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে জোর করে হাসল রানা। 'না। প্রতিজ্ঞা করেছি, মরতে রাজি, কিন্তু নকশা দেব না।'

হ্যাঁ কিংবা না, দুটোর একটা উত্তর আশা করছিল সবাই। হ্যাঁ মানে, যুদ্ধ নয়। না মানে, যুদ্ধ।

রানা থামতেই চমা মং বুক টান করে এক পা এগোল চুচ্যাং-এর দিকে। জিভ বের করে ঘাটা চেটে নিয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল তারু তাকুন।

মুরং ওয়াকলাই পিছিয়ে গেল এক পা। একটা চোখ দিয়ে দেখছে চুচ্যাংকে।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চুচ্যাং-এর দিকে মিরহাম, স্কার্ফের পকেটে ঢুকে গেছে ডান হাত।

কোন রকম প্রতিক্রিয়া নেই শুধু সিকুবা আ-র মধ্যে। কি হয় না হয় এই রকম একটা পরিবেশ, কিন্তু খেয়ালই নেই তার এদিকে। চমা মং-এর দিকে চেয়ে আছে। চেয়েই আছে।

চুচ্যাং-এর চোখে হিংস্র দৃষ্টি।

নাক চুলকাতে ভুলে গিয়ে প্রাণহীন জড় পদার্থের মত বসে আছে কুতজার। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে গলার ঝিনুকের মালাটা মৃদু মৃদু দুলছে।

অদ্ভুত মোলায়েম গলায় মিরহাম বলল, 'রাত অনেক হয়েছে। খিদে পেয়ে গেছে আমার।' পরিস্থিতিটা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছে সে, 'দলের আর সবাই দুশ্চিন্তা করছে। চলো, রওনা দিই। পেটে খিদে নিয়ে চিন্তা করতে পারি না আমি।' উঠে দাঁড়াল সে, পকেট থেকে বের করল রিভলভারটা।

ধক করে উঠল রানার বুক। রিভলভার হাতে এগিয়ে আসছে মিরহাম ওর দিকে।

চুচ্যাং চোখ ফেরাল, রানার দিক থেকে মিরহামের দিকে।

সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে এখন মিরহামের দিকে। কিছু একটা করবে সে। যা করবে, বাধা দেবে না কেউ। দলপতির কাজে বাধা দেয়া মানে—যুদ্ধ ঘোষণা।

কিছু একটা করা দরকার, কিছু একটা বলা দরকার, অনুভব করল রানা, 'দলের আর সবাই মানে?'—প্রশ্ন করল সে। 'ধরা পড়বার ভয় নেই তোমার, এত লোকজন সাথে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছ এতদূর?'

কোন জবাব দিল না মিরহাম। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে।

চুচ্যাং বাঁকা দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চল হয়ে উঠল সে। মাথা নেড়ে বাবরি দোলাল, 'মিরহাম, আমি তোমার সহকারী। আমাকে মারতে দাও।' এগিয়ে আসছে সে। হাঁটার ভঙ্গিটা দেখে আদিম যুগের মানুষের কথা মনে পড়ল রানার।

রানার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে মিরহাম। কথা বলল না।

নিস্তব্ধ চারদিক। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে চুচ্যাং, মিরহামের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আমি মারবো ন্-বুরহেকে।'—ন্-বুরহে মানে কুকুর।

রানার চোখের ওপর থেকে চোখ সরাল না মিরহাম। নিচু গলায় চুচ্চ্যা

এর উদ্দেশে বলল, 'পাহাড়ের ওপারে রয়েছে জ্যান্ত খাবার। চিন্তা করে দেখ চুচ্যাং—আমার খাবার, খাব না আমি। কথা যদি মানিস, তুই পাবি।'

খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে? বুঝতে পারছে না রানা। কি করবে মিরহাম, কি করতে চাইছে? সময় ব্যয় করা দরকার, কিছু বলা দরকার, আবার অনুভব করল ও, 'জ্যান্ত খাবার মানে, মিরহাম?'

'মানে?' কর্কশ কণ্ঠে বলল মিরহাম, 'মানে মেয়েমানুষ। লুঠ করে এনেছি। তোমার প্রাণের বিনিময়ে দিয়ে দেব ওটা চুচ্যাংকে।'

'তোমার আদেশই যথেষ্ট নয়? তুমি সর্দার না?'

'সর্দারকে সবার মন বুঝে চলতে হয়। দরকার হলে তোয়াজ করতে হয় অনুচরকেও।'

'আমাকে খুন করলে কি করে পৌঁছবে লালপাহাড়ে?'

'সেটা বোঝার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ওর নেই।' চুচ্যাং-এর দিকে ফিরল মিরহাম। 'ভেবে দেখ, চুচ্যাং। জ্যান্ত খাবার, না খুন—কোন্‌টা চাস্?'

'তার মানে খুন করবে না...'

'করব।'

গলা শুকিয়ে গেল রানার। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সবাই প্রস্তর মূর্তির মত অপেক্ষা করছে। মিরহাম দলপতি, তার কাজে বাধা দেবার প্রশ্নই উঠছে না কারও মনে। যা-ই ঘটুক, দেখবে ওরা নীরব দর্শক হিসেবে। একমাত্র ব্যতিক্রম চম্মা মং—তার ভিতর আশ্চর্য এক চাপা প্রস্তুতির ভাব লক্ষ করল সে। দেখল, সবার অলক্ষ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে সিকুবা আ কুঠার হাতে, চেয়ে আছে চম্মা মং-এর মুখের দিকে।

মিরহাম আবার বলল, 'করব।'

'তো করো।'

'করব।' আবার বলল মিরহাম, 'তাহলে জ্যান্ত খাবার পাবি না। ভেবে দেখ।'

মাটির দিকে চোখ নামাল চুচ্যাং। ভাবছে।

বুকের ভিতরটা কাঁপছে রানার। খুনের নেশা, না, নারীদেহের প্রলোভন? চুচ্যাং কোন্‌টার কাছে পরাজিত হবে?

'দেরি করিস না, দেরি করিস না।' তাড়া দিল মিরহাম।

মাথা তোলার কোন লক্ষণই দেখা গেল না চুচ্যাং তাগলের মধ্যে। বিরাট একটা সমস্যায় পড়ে গেছে যেন সে।

রানাকে নয়, সবাই দেখেছে চুচ্যাংকে। কয়েক পা এগিয়ে এসেছে সুপুরুষ চম্মা মং।

ঝাড়া দু'মিনিট পর মুখ তুলল চুচ্যাং। বলল, 'আমার খাবারে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না।'

'ঠিক আছে।' রাজি হলো মিরহাম, রানার বুক থেকে রিভলভার নামিয়ে নিল। 'চলো এবার। এগোও সবাই।' বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, 'বন্দী থাকবে তোমার সঙ্গে। তাকু তাকুন, খবরদার, আবার ঘা চাটছিস! চম্মা মং, পথ

দেখাও। কথা বলবে না কেউ!'

'কথা আমি বলব।' স্বল্পবাক সিকুবা আ আঙুল তুলে রড়ি আঁফার লাশ দেখিয়ে বলল, 'না-ফেলে যাব। ভূত হয়ে যাবে! ওকে না ফেলে যাব আমি।'

'কী আশ্চর্য। এসব কি?'

'রড়ি আঁফা মার্মা না ছিল? আমি মার্মা না আছি?' সিবুকা আ বলল, 'ওকে আমি সাথে নেব, ফিরিয়ে দেব জ্ঞাতির কাছে।'

'মানে? আমরা কি ওদের এলাকায় যাচ্ছি?'

'কেউ না যাবে, আমি যাব।'

'তোমরাই বলো, এখন কি করি আমি!' তাকাল মিরহাম সবার দিকে।

মিরহামের ঘর্মাক্ত কলেবরের দিকে চেয়ে আছে রানা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'লাশটা নিতে চাইছে, নিক না…'

ঘুসিটা চোয়ালে লাগল, পরমুহূর্তে রানা অনুভব করল মাটিতে পড়ে গেছে সে। আচমকা আঘাত খেয়ে নয়, মিরহামের শরীরে বিদ্যুতের গতি দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে সে। ঘুসিটা কখন, কোন্‌দিক থেকে যে এল, টেরই পায়নি ও।

এগিয়ে এল মিরহাম। লাথি মারবে, বুঝতে পেরে দুই হাত শক্ত হয়ে গেল রানার। পা ধরবে ও।

টের পেল মিরহাম।

'ধরবি? এই নে, ধর।' আস্তে করে ডান পা-টা তুলে দিল মিরহাম রানার মুখের দু'ইঞ্চি ওপরে।

চেয়ে রইল রানা। আগুন জ্বলছে ওর শরীরে। কিন্তু টোপ গিলল না।

'ভয় পেলি?' হাহ্‌ হাহ্‌ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মিরহাম। যেমন আচমকা হাসতে শুরু করল, তেমনি মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল হাসি। মুখটা কদাকার করে বলল, 'আমাকে কেউ উপদেশ দেবে না।' সকলের উদ্দেশে বলল, 'আমার অনুমতি না নিয়ে এখন থেকে কোন কথা বলবে না কেউ। কথা বললে গুলি করব আমি। চম্রা মং, আগে বাড়ো।' রানা লক্ষ করল, সবাইকে তুই-তোকারি করলেও সুদর্শন চম্রা মংকে মিরহাম 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে। আরও লক্ষ করল, অনুমতি ছাড়াই অবলীলাক্রমে কাঁধে তুলে নিল সিকুবা আ রড়ি আঁফার লাশ, দেখেও দেখল না মিরহাম। বুঝল, এদের দু'জনকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতে হচ্ছে মিরহামের, কিন্তু খুশি মনে নয়, সুযোগ পেলেই ছোবল হানবে সে।

রওনা হলো সবাই। একটা অসন্তোষ দানা বাঁধছে রানার মনের ভিতর। মিরহামকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার একটা উগ্র ইচ্ছা জেগেছে ওর মধ্যে। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে খুব বেশি সময় লাগবে না ওর। প্রথম সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করবে সে। কিন্তু তার আগে শায়েস্তা করতে হবে মিরহামকে—সম্ভব হলে চুচ্যাং তাগলকেও।

নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে রানা। একদল কাণ্ডজ্ঞানহীন দস্যুর খপ্পরে পড়ে গিয়েছে সে। যতক্ষণ নকশাটা চেপে রাখতে পারবে ততক্ষণ এদের

কাছে ওর প্রাণের মূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা। কিছুতেই যাতে পালাতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে চাইবে ওরা যেমনভাবে পারে। সেই সঙ্গে চেষ্টা চালাবে নকশাটা ওর কাছ থেকে উদ্ধার করবার। হয়তো প্রচণ্ড নির্যাতন করবে, বাধ্য করবে নকশাটা এঁকে দিতে। কিন্তু নকশা যদি এঁকেও দেয়, ওকে ওরা না পারবে মারতে, না পারবে ছাড়তে। সঠিক নকশা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ওর সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না মিরহাম।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? গোম্পা মন্দিরে না পৌঁছানো পর্যন্ত রানাকে ছাড়বে না মিরহাম। যদি কোন সুযোগে পালাতে না পারে, লালপাহাড়ে যেতে হবে ওকে এদের সঙ্গে। এদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই আসল নকশা ছিল রড়ি আঁফার কাছে, মৃত্যুর আগে সেটা দিয়ে গেছে বুড়ো ওকে। যদি তাই হয়, একদল আরাকানী দস্যু মন্দির লুটে রুবিগুলো নিয়ে যাবে, সেটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। পালাতে হবে—সিদ্ধান্ত নিল রানা—প্রথম সুযোগেই পালাতে হবে ওকে।

সবার অলক্ষ্যে একটা ফুঁ দিল রানা ডগ-হুইসলে। কেউ কিছুই টের পেল না, একটু আওয়াজ হলো না, কিন্তু যার বোঝার সে ঠিকই বুঝে নিল ইঙ্গিতে। চলতে চলতে বার দুই মাথা উঁচু করে দূরে তাকাল রানা—গুণ্ডার অস্তিত্ব অনেকটা স্বস্তি জোগাল ওর মনে।

সবার আগে পথ দেখিয়ে এগোচ্ছে চয়া মং, সবার পেছনে কাঁধের ওপর লাশ নিয়ে সিকুবা আ। দলের ঠিক মাঝখানে মিরহামের ঘোড়ার পিঠে ওঠানো হয়েছে রানাকে, বসানো হয়েছে মিরহামের পিঠে-পিঠ ঠেকিয়ে উল্টো ভাবে।

পাহাড়ে না চড়ে ঘুর-পথে এগোল ওরা। ঘণ্টাখানেক দুলকি চালে ছুটল ঘোড়ার দল, তারপর রানার নাকে এল মাংস আর চর্বি পোড়ার গন্ধ। খাবারের গন্ধে খুশি হয়ে উঠল মিরহাম। ঢোক গিলল।

'আ গিয়া! দেখা যাবে আজ কে কত খেতে পারে!'

গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ ফাঁকা একটা জায়গায় পৌঁছুল ওরা। আগুন জ্বলছে মাঝখানে। মেয়েলোক ও কয়েকটা ভারবাহী ঘোড়ার ছায়ামূর্তি দেখল রানা। আগুনের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল ঘোড়া।

মিরহাম নামল। রানাও।

'দাঁড়াও এখানে।' নির্দেশ দিয়েই ঘুরে হাঁটতে শুরু করল মিরহাম।

না তাকিয়েও রানা বুঝতে পারল, আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে মিরহাম। কথা বলছিল চয়া মং, ওয়াকলাই, তারু তাকুন। একযোগে মাঝ পথে থেমে গেল সবাই। কে যেন দৌড়ে আসছে, শব্দ ঢুকল কানে। থেমে গেল পদশব্দ।

সামনে আগুন। কেউ নেই। সবাই ওর পেছনে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

সোজা রানার দিকে ছুটে আসছিল মেয়েটা, থমকে দাঁড়িয়েছে, রানা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই আবার ছুটল। সেই সঙ্গে চিৎকার, 'রানা! রানা! রানা! রান্না…!'

নিজের অজান্তেই দুই পা এগিয়ে গেল রানা। ওর বুকের ওপর এসে

আছড়ে পড়ল মেয়েটা। কোনমতে তাল সামলে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

রানাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শিরিন কাওসার।

তিন

মাথার পেছনে ধাতব পদার্থের টোকা পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা পিছন দিকে। মিরহাম দাঁড়িয়ে। রিভলভার ধরা হাতটা নাড়ল সে। ইঙ্গিত করছে সরে আসবার।

দুই হাতে দু'কাঁধ ধরে বুকের সঙ্গে লেপ্টে থাকা শিরিনকে সরাল রানা।

'তুমি কি করে এলে এখানে?' নিচু গলায় জানতে চাইল।

'ধরে এনেছে। দুপুরে। জামান সাহেবের বাড়িতে ডাকাতি করেছে এরা।'

'তা তো বুঝলাম। কি করে? বাধা দেয়নি কেউ?'

'দিয়েছিল। জসিম আর সিরাজ মারা গেছে বাধা দিতে গিয়ে। হালিম পালিয়ে গেছে। বাড়িটা জ্বালিয়ে দিয়েছে এরা। আমাকে—'

আবার টোকা পড়ল মাথার পেছনে। অসহিষ্ণু টোকা, অপেক্ষাকৃত জোরে।

'তুমি দাঁড়াও এখানে।' ইংরেজিতে বলল রানা। 'আমি দেখি এদের সঙ্গে কোন টার্মসে আসা যায় কিনা।'

আবার টোকা দেয়ার জন্যে রিভলভার তুলেছিল মিরহাম, রানা ঘুরে দাঁড়াতে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল আবার। কয়েক পা সরে গেল রানা, মিরহামের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'কি? লালপাহাড়ে যেতে চাও তুমি? আমার সাহায্য পাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

'আছে।'

'তাহলে এই মেয়েটাকে এক্ষুণি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করো রামুতে।'

বিচিত্র এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল মিরহামের ঠোঁটে।

'ফেরত দেয়ার জন্যে কোন জিনিস নেয় না মিরহাম। সাহায্য আদায় করে নিতেও জানে। ফালতু ডাঁট দেখাচ্ছ তুমি, ছোকরা। তাছাড়া, কার জিনিস ফেরত দেব আমি? কথা দিয়ে কথা ফেরত নিতে পারি না। তুমি জানো, তোমার প্রাণের বিনিময়ে চুচ্যাং-এর হাতে তুলে দিয়েছি আমি ওকে। ও এখন চুচ্যাং তাগলের।'

উল্লাসে অধীর মানুষ যেমন মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ করে, তেমনি একটা শব্দ ভেসে এল। রানা ও মিরহাম ঘাড় ফিরিয়ে চাইল একই সঙ্গে।

আগুনের লাল আভায় লালচে দেখাচ্ছে সবকিছু। এগিয়ে আসছে চুচ্যাং তাগল। পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে যেন সবাই, চেয়ে রয়েছে চুচ্যাং-এর দিকে। মিরহামের সঙ্গে রানার কথাবার্তার বিষয়বস্তু আঁচ করে নিয়েছে সবাই। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, টের পেয়েছে প্রত্যেকেই। মুখ দিয়ে বিচিত্র কাম

ধ্বনি করতে করতে শিরিনের পেছনে এসে দাঁড়াল চুচ্যাং। লোমশ। নগ্ন। বীভৎস।

পেছন ফিরে চেয়েই চমকে উঠল শিরিন কাওসার। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। ছুটে চলে আসবার চেষ্টা করল এদিকে, কিন্তু এক পা ফেলতেই চেপে ধরল চুচ্যাং ওর চুলের মুঠি। হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল ওকে বুকের ওপর।

ঠিক কুকুরের মত শুঁকছে চুচ্যাং শিরিনের শরীর। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে সবক'টা। বুকটা ছন্দোবদ্ধভাবে দোলাচ্ছে সামনে পেছনে, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে শিরিনের নাকে মুখে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। দাউ দাউ জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড। বাতাস লেগে কখনও উজ্জ্বল হচ্ছে, কখনও নিষ্প্রভ। লালচে আলোয় বিপদের আভাস।

শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল রানা, 'ওকে ছেড়ে দিতে বলো, মিরহাম।'

রানার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে ঝট্ করে রানার দিকে ফিরতে বাধ্য হলো মিরহাম।

'তোমার মেয়েমানুষ? বিয়ে করা বউ?'

'না।'

'তাহলে? তাহলে তোমার কিসের মাথাব্যথা? আনন্দ হচ্ছে, হোক। দেখুক সবাই। চুচ্যাংকে কথা দিয়েছি আমি।'

এঁকেবেঁকে চুচ্যাং-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করছে শিরিন। দুই হাতে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে গরিলাটাকে। আঁচল খসে গেছে কাঁধ থেকে। বাঁকা একটা পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল চুচ্যাং ওর কোমর, একহাতে টেনে ধরে রাখল চুলের গোছা, আরেক হাতে চড় চড় করে ছিঁড়ে নামিয়ে দিল ব্লাউজ।

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল শিরিন। 'রানা? বাঁচাও!' দুই হাতে বুক ঢেকে রেখেছে সে।

রানাকে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখে হেসে উঠল মিরহাম। কৌতুকে নাচছে চোখের মণি দুটো।

'এখন বাধা দিতে গেলে মারা পড়বে, ছোকরা। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। জোর যার মুল্লুক তার।'

আচমকা ল্যাঙ মেরে মাটিতে ফেলে দিল চুচ্যাং শিরিনকে, একটা পা তুলে দিল ওর নাভির ওপর, তারপর মাথা তুলে তাকাল সবার দিকে। বিজয়ীর হাসিতে উদ্ভাসিত চোখ মুখ।

'এখনও বলছি, মিরহাম, বারণ করো ওকে। নইলে…'

'নইলে? নইলে কি?'

'অনর্থক মারা পড়বে চুচ্যাং তাগল।'

'মারা পড়বে!' বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল মিরহামের ঠোঁটে। 'কে মারবে? তুমি? চেষ্টা করেই দেখো না?'

দড়াম করে প্রচণ্ড এক কারাতের কোপ পড়ল মিরহামের ঘাড়ের পাশে। পরমুহূর্তে পাঁজর বরাবর একটা কারাতে সাইড কিক্ পড়তেই ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল মিরহাম পাঁচ হাত তফাতে। হাত থেকে খসে বহুদূরে গিয়ে পড়ল রিভলভারটা। কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই তিন লাফে পৌঁছে গেল রানা শিরিনের পাশে।

উবু হয়ে বসে শাড়ি খোলার কাজে ব্যস্ত ছিল চুচ্যাং—আদিম ক্ষুধায় উন্মাদ। রানার উপস্থিতি টেরই পেল না সে প্রথমটায়। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষিপ্র লোকটার গতিবেগ। ধস্তাধস্তি করছিল শিরিন। রানাকে দেখেই স্থির হয়ে গেল সে, সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ টের পেয়ে ঘাড় ফেরাল চুচ্যাং।

প্রচণ্ড এক লাথি চালিয়েছিল রানা চুচ্যাং-এর শিরদাঁড়া সই করে। খপ্ করে একহাতে পা-টা ধরেই উঠে দাঁড়াল সে, ঠেলে দিল সামনের দিকে।

হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা তাল সামলাতে না পেরে। পড়েই এক গড়ান দিয়ে সরে গেল একপাশে। 'হুঁক্' করে শব্দ হলো পাশেই। রানার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল চুচ্যাং, পড়ল মাটির ওপর। পড়েই উঠে দাঁড়াল একলাফে। রানাও উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'জনের চোখেই খুনের নেশা। গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল দু'জন, খুঁজছে প্রতিপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ, ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে অপরের ওপর, হাত-পা চলছে সমানে।

কেউ বাধা দিচ্ছে না ওদের, কেউ এগিয়ে এল না কারও সাহায্যে। যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছে খেলা। উঠে দাঁড়িয়েছে মিরহাম, রিভলভারটাও খুঁজে পেয়ে তুলে নিয়েছে মাটি থেকে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে সে-ও গ্রহণ করল দর্শকের ভূমিকা। চুচ্যাং-এর জয় সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই তার মনে।

মারামারি দেখে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে সিকুবা আ, হাসিমুখে বাম হাতে চাপড় মারছে নিজের উরুতে। ভুরু কুঁচকে উঠেছে একচোখো ওয়াকলাই এবং তারু তাকুনের। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুবেশ চম্রা মং—যেন মল্লযুদ্ধটা হচ্ছে তারই সম্মানে, বিজয়ীকে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে তার খেলা শেষে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে তিনজন স্ত্রীলোক। দেহের ওপরের অংশ অনাবৃত। তারাও উপভোগ করছে দুই পুরুষের নারীঘটিত লড়াই।

বার বার জাপটে ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে তুমুলবেগে আট-দশটা বেমক্কা ঘুসি খেয়ে সরে আসতে হচ্ছে চুচ্যাংকে, কিছুতেই নাগালের মধ্যে পাচ্ছে না সে রানাকে। একটা লাথি বা ঘুসিও লাগাতে পারেনি সে রানার শরীরে, অথচ নিজের নাক-মুখ চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছে দরদর করে, তলপেটে দুটো প্রচণ্ড লাথি খেয়ে বমি ঠেলে আসতে চাইছে ওপর দিকে। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর কাছে, যত সহজ ভেবেছিল তত সহজ হবে না এই বাঙালীকে কাবু করা।

রানা বুঝে নিয়েছে, একবার যদি চুচ্যাং ওকে দুই হাতে কায়দামত জাপটে ধরতে পারে, তাহলে আর রক্ষা নেই। পিষেই মেরে ফেলবে। তাই স্থির করেছে, নাগালের বাইরে থেকে ঘুসি আর ফ্লাইং কিকের সাহায্যে ওকে যত দ্রুত সম্ভব, কাহিল করে আনতে হবে।

যত মার খাচ্ছে, ততই হিংস্র হয়ে উঠছে ভয়ঙ্কর গরিলাটা। হঠাৎ মরিয়া হয়ে দুই হাত চিলের ডানার মত দু'পাশে মেলে সে ছুটে গেল রানার দিকে। দমাদম দুটো ঘুসি মারল রানা, কিন্তু পিছিয়ে যেতে গিয়ে হোঁচট খেল একটা পাথরের টুকরোর সঙ্গে পা বেধে। সুযোগ বুঝে ঝাঁপ দিল চুচ্যাং। রানাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে, জড়িয়ে ধরল ওকে ইস্পাতদৃঢ় দুই বাহুর বেষ্টনিতে।

এতক্ষণে হাসি ফুটে উঠল মিরহামের ঠোঁটে। দু'পা এগিয়ে এল সে সামনে।

রানাকে জড়িয়ে ধরেই উঠে দাঁড়াল চুচ্যাং। হাসি ফুটেছে তারও ক্ষতবিক্ষত মুখে। বিজয়ীর দৃষ্টিতে চাইল এপাশ ওপাশ। তারপর নিজের বুকের সঙ্গে ঠেসে ধরে জোরে চাপ দিল। মুহূর্তে কালো হয়ে গেল রানার মুখটা। মানুষের শরীরে যে এত শক্তি থাকতে পারে, কল্পনাও করা যায় না। দম বেরিয়ে যাওয়ার দশা হলো ওর। সর্ষেফুল দেখছে চোখে।

দ্বিতীয়বার চাপ দেয়ার আগেই চট করে মুঠি পাকানো ডান হাতটা ভরে দিল রানা দু'জনের মাঝখানে। মধ্যমার উঁচু হাড়টা ঠেকে রয়েছে চুচ্যাং-এর পাঁজরার একটা হাড়ের সঙ্গে। এবার প্রাণপণ শক্তিতে চাপ দিল চুচ্যাং। হ্যাঁচকা চাপ দিয়েই দাঁতে দাঁত চেপে বিকৃত করে ফেলল মুখের চেহারা। ককিয়ে উঠল তীক্ষ্ণকণ্ঠে। এত তীব্র ব্যথা জীবনে পায়নি সে। রানাও ব্যথা পেল, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

এই সুযোগে এক ঝটকায় সরে আসবার চেষ্টা করল রানা; কিন্তু পারল না। সামান্য কিছুটা ঢিলে হয়েছে বটে; কিন্তু আলগা করা গেল না ওর বজ্র-বন্ধন। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে জুডোর কৌশল প্রয়োগ করল রানা। ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল চুচ্যাং, কিন্তু ছাড়ল না রানাকে—উঠে দাঁড়াল আবার। আবার একটা আছাড় মারল রানা ওকে। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার যখন উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে, চট্ করে শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়ে হিপ্ থ্রো করল রানা। আর রানার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল চুচ্যাং কয়েক হাত তফাতে। চেঁচিয়ে উঠে উল্লাস প্রকাশ করল সিকুবা আ। পতনে চুচ্যাং-এর কিছুই হয়নি, উঠে দাঁড়াল আবার। এবার আর কোনরকম সুযোগ না দিয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিল রানা। তিন পা এগিয়ে লাফিয়ে উঠল শূন্যে, প্রচণ্ড একটা ফ্লাইংকিক্ লাগাল চুচ্যাং-এর নাকের ওপর। আছড়ে পড়তেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল রানা ওর বুকের ওপর। দমাদম দুর্বল নার্ভ-সেন্টারে গোটা কয়েক কিল, ঘুসি আর কারাতের কোপ খেয়ে ব্যথায় কুঁকড়ে বাঁকা হয়ে গেল চুচ্যাং—তারপর আচমকা জোড়া পায়ের লাথি মেরে বসল রানার বুকে।

ছিটকে বিশাল অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়ে পড়ল রানা, একটা পাথরের ওপর মাথাটা জোরে ঠুকে যেতে হতচকিত হয়ে গেল সে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল চুচ্যাং, রানার বুকের ওপর উঠে দুই হাতে টিপে ধরল কণ্ঠনালী। সংবিৎ ফিরে পেল রানা, দুই হাতে চেপে ধরল চুচ্যাং-এর হাতের কব্জী, দাঁতে দাঁত চেপে গলা থেকে সরাবার চেষ্টা করল ওর হাত।

হঠাৎ খেয়াল পড়ল ওর, সামনে থেকে কেউ গলা চেপে ধরলে কি করতে হয়। কব্জী ছেড়ে দিয়ে চুচ্যাং-এর দুই হাতের দুটো কড়ে আঙুল ধরেই জোরে একটা ঝট্‌কা দিল পেছন দিকে। 'কড়াৎ' শব্দে ভেঙে গেল আঙুল দুটো। আর্তনাদ করে উঠল চুচ্যাং। আলগা হয়ে গেল রানার কণ্ঠনালী টিপে ধরা হাত দুটো। রানাকে নড়ে উঠতে দেখে ডান হাতটা ভাঁজ করে কনুই চালাবার জন্যে উদ্যত হলো চুচ্যাং—এক আঘাতেই নাক-মুখ খেঁতলে সমান করে দেবে। উপায়ান্তর না দেখে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল রানা। শুয়ে শুয়েই প্রাণপণ শক্তিতে কারাতের কোপ মারল সে চুচ্যাং-এর কণ্ঠনালী সই করে।

মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেল চুচ্যাং-এর মুখটা। দুই হাত চলে গেছে ওর নিজের গলার কাছে। শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে সে মুখ হাঁ করে। পারছে না দেখে নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়াল রানার বুকের ওপর থেকে। দুই চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। মাটিতে শুয়েই জোড়া পায়ের লাথি মারল রানা ওর তলপেটে, তারপর উঠে দাঁড়াল এক লাফে।

টলতে টলতে অগ্নিকুণ্ডের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল চুচ্যাং তাগল, দিশা হারিয়ে ফেলেছে সম্পূর্ণভাবে, দুই হাত গলায়, মুখ হাঁ করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে এখনও, ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। কয়েক সেকেন্ড আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল চুচ্যাং—দেখা যাচ্ছে না আর।

চার

মাংস-পোড়া উৎকট গন্ধে যেন সংবিৎ ফিরে পেল সবাই একসঙ্গে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাঁজ করা হাত দুটো বুক থেকে নামিয়ে মৃদু হাসল চয়া মং।

উদ্বাহু নৃত্য করছিল সিকুবা আ, লোফালুফি করছিল কুঠারটা—থমকে থেমে দাঁড়াল।

ঘা চাটতে ভুলে গেছে তারু তাকুন।

মিরহামের দু'চোখে আগুন। এগিয়ে এল এক পা। হাতের রিভলভার রানার বুকের দিকে তাক করে ধরা।

বাতাসে মাংস-পোড়া গন্ধ তীব্রতর হচ্ছে। চড় চড় শব্দ হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে।

'আর কারও সাহস আছে এর গায়ে হাত দেবার?' দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে শিরিনের পাশে দাঁড়াল রানা। তাকাল প্রত্যেকের দিকে।

জবাব দিল না কেউ। মিরহাম শুধু আঙুল নাচাল শূন্যে বাঁ হাত তুলে।

গলার ঝিনুকের মালা দুলিয়ে ছুটল কুতজার অগ্নিকুণ্ডের দিকে। ঘা চাটতে চাটতে তাকে অনুসরণ করল তারু তাকুন।

চয়া মংকে ইঙ্গিত করল মিরহাম। রাইফেলটা নিল চয়া মং, তবে তাক করল না সেটা রানার দিকে। কিন্তু একই ইঙ্গিত পেয়ে এক-চোখো ওয়াকলাই রাইফেল তাক করে ধরল রানার দিকে।

এগিয়ে আসছে তিনজন।

কৃতজ্ঞার আর তারু তাকুন চুচ্যাংয়ের লাশ সরাচ্ছে আগুনের ভিতর থেকে।

রানার দু'পাশে দাঁড়াল চয়া মং আর ওয়াকলাই। সামনে মিরহাম। বিস্ময়ের ধাক্কাটা পুরোপুরি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। ঘাড় ফিরিয়ে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকাল একবার। মাথা দোলাল এদিক ওদিক। তারপর রানার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, যেন এই প্রথম দেখছে।

'জানো, চুচ্যাং আমার ডান হাত ছিল? ওর গায়ের জোরের জন্যেই ওকে সাথে এনেছিলাম?'

'তো কি? এবার বাম হাতটা কে বলো, সেটাও ভেঙে দিচ্ছি।'

'নাহ্!' মিরহাম মাথা দোলাল, 'রাগী মানুষ তুমি।' ভেবেচিন্তে কথা বলছে সে, 'গুলি করলে কি হত?'

'বুঝতেই পারছ, মৃত্যুকে ভয় করি না আমি।'

মাথা দোলাল মিরহাম। হ্যাঁ, বুঝতে পারছে সে।

'শোনো, মিরহাম।' রানা বলল, 'লালপাহাড়ে যাব কি যাব না সেটা আমার ইচ্ছে। যদি যাই, স্বাধীনভাবে যাব। যেতে না চাইলে, কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু কথাটা মনের মধ্যে ভালমত বসিয়ে নাও এখনি।'

'তোমার সাহস আছে, ছোকরা। মানি সে কথা। মরতে ভয় পাও না, জানি। কিন্তু না-মেরেও মানুষকে কষ্ট দেয়া যায়। তুমি···তোমার মেয়েমানুষ··· দুজনে আমার হাতে বন্দী। লালপাহাড়ে যাবে তুমি আমার ইচ্ছায়—নইলে তোমার চোখের সামনে তোমার মেয়েমানুষকে···'

'আমি ঠিক করেছি, যাব।' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'পৌঁছবার রহস্য আমার কাছে আছে, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব তোমাদের। কিন্তু এই মেয়ের নিরাপত্তা চাই। মানো সেকথা?'

'মানি।'

'তাহলে এক্ষুণি একে রামুতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

মাথা নাড়ল মিরহাম। 'মানি না। একে হাতে রেখে তোমাকে চালাব আমি। এর ওপর কোন অত্যাচার হবে না যদি তুমি ঠিক ঠিক নিয়ে যাও আমাদের পথ দেখিয়ে।'

'সেক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, শক্তির ভারসাম্য আনতে হবে।' পষ্টাপষ্টি জানাল রানা।। 'ওখানে পৌঁছে আমাদের খুন করবে না, তার কি নিশ্চয়তা? আমার লোকও থাকতে হবে সঙ্গে। থাম্পা মন্দিরে যা পাওয়া যাবে সমান ভাগে ভাগ করে নেব আমরা সবাই।'

'ঠিক, ঠিক। বলে যাও।'

'তোমরা মোট সাত···ছ'জন এখন; আমার দলেও থাকবে আরও

পাঁচজন। মেয়েদের গোণার মধ্যে ধরা হবে না। রাজি?'

মাথা দোলাল না এবার মিরহাম। সবাই চেয়ে আছে মিরহামের দিকে। এ ব্যাপারে সচেতন সে। মাটির দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছে।

'কোথায় পাবে তোমার বন্ধুদের এখানে?'

'যে বাড়িতে ডাকাতি করেছ সেখানে লোক পাঠিয়ে জামান সাহেবকে খবর দাও, সে-ই জোগাড় করবে বাকি চারজনকে। আমি পাঠিয়েছি শুনলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে সে।'

মিরহাম আবার চিন্তায় পড়ল। অনেকক্ষণ পর তাকাল সে নিজের দলের দিকে, 'তোমরা কি মনে করো?'

সঙ্গে সঙ্গে কেউ উত্তর দিল না।

মিরহাম তাকাতেই, ঘা থেকে সরিয়ে নিয়ে জিভটা মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিল তারু তাকুন, নিস্তব্ধতা ভাঙল সে-ই, 'উপায় দেখছি না আর।'

'তোমার মতই আমার আর সিকুবা আ'র মত, মিরহাম।' বলল চমা মং, 'থাম্পা মন্দির নরকের চেয়েও দূরে। লোকজন আরও এলে মন্দ হয় না।'

কড়ে আঙুল দিয়ে নাক চুলকোতে চুলকোতে কুতজার বলল, 'আমি শর্ত দিচ্ছি।'

'কিসের শর্ত?'

'জামানের বাড়িতে আমি যাব।'

মিরহাম তাকাল ওয়াকলাইয়ের দিকে, 'তুই চুপ কেন?'

'আরও পাঁচজন? নাহ্! কে জানে পাঁচজনের জায়গায় পঁচিশজন আসবে না?'

'তুই নিজে যা। সঙ্গে যাবে কুতজার।'

ওয়াকলাই বলল, 'রাজি আছি।'

রানা বলল, 'আমি চমা মংকেও যেতে বলি।'

ঝট্ করে তাকাল মিরহাম রানার দিকে। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে, কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলল না। খানিকক্ষণ চিন্তা করল সে। তারপর বলল, 'চমা মংয়ের কথা আমিও ভেবেছি।'

রানা বলল, 'সব ঠিক হয়ে গেল তাহলে, কেমন?'

'না।' গম্ভীর মিরহাম, 'চুচ্যাং তাগলকে খুন করেছ তুমি। ঠিক? আমি কিছু বলিনি তোমাকে। ঠিক? কিছু বলিনি কেন?'

রানা চুপ করে রইল।

'তোমার কাছে নকশা আছে, তাই। কিন্তু মিরহাম মার্মা আমি, চিনতে ভুল কোরো না আমাকে। মরতে ভয় পাই না আমিও। ইচ্ছে হলে হাজার কোটি টাকায় থুক্ও দিতে পারি। যদি ইচ্ছা করি, তোমাকে খুন করব। তবে, আমার বিরুদ্ধে তুমি যতক্ষণ কিছু না করবে, ততক্ষণ তোমাকে আমি কিছুই বলব না। দেবতার তৃতীয় নয়ন চাই আমার। কেউ হাত দিতে পারবে না সেটাতে।'

রানা কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত রইল।

'আরও একটা কথা। তোমার স্বাধীনতা—বিবেচনা করব সময় এলে। তুমি আমার বন্দী। বন্দী হয়েই থাকবে। পালিয়ে যাবার কোন সুযোগ…'

কথাটা আর শেষ করতে পারল না মিরহাম, দুলে উঠল একদিকের জঙ্গল, গর-গর চাপা গর্জনের শব্দে কেঁপে উঠল সবার বুক। মেয়েমানুষ তিনজন দাঁড়িয়েছিল একধারে, বাঘটা পড়ল তাদের মাঝখানে। গলা ছেড়ে হুঙ্কার দিল একটা। যুবতী দু'জন প্রাণপণে দৌড়ুল দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করতে করতে। বুড়ির একটা হাত কামড়ে ধরে এক ঝট্‌কায় তাকে পিঠের ওপর ফেলল বাঘটা, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে চলে গেল ঝোপের আড়ালে।

পলকের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সবাই। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে মুখ।

নড়ে উঠল রানা। হুইস্‌লটা মুখে তুলে ফুঁ দিল তিনবার।

সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠল গুণ্ডা—ঘেউ! ঘেউ! ঘেউ!

গর গর করে ডেকে উঠল বাঘটা। কাছেই। বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সে ডাক শুনলে।

'চলো সবাই।' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'বেশি দূর যেতে পারবে না বাঘটা।'

নড়ল না কেউ।

'আমার কে হয় ও?' অন্যদিকে চেয়ে বলল তারু তাকুন। 'আমি মিছে মরতে যাব কেন?'

চড়াৎ করে একটা চড় কষাল রানা তারু তাকুনের গালে, একটা ঝট্‌কায় রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে তিন লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভিতর।

অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সবাই, কিন্তু নড়ল না কেউ। মিরহামও না।

গুণ্ডার গলার আওয়াজ অনুসরণ করে ছুটল রানা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রায় অন্ধের মত। গজ পঞ্চাশেক গিয়েই একটা ফাঁকা জায়গায় দেখতে পেল সে বাঘটাকে।

দুনিয়া ফাটিয়ে চিৎকার করছে নির্ভীক গুণ্ডা। সেই সঙ্গে একবার এদিকে, একবার ওদিকে ছুটছে। আগলে রাখছে পথ, যেতে দেবে না বাঘটাকে।

মুখ ঝামটা দিচ্ছে বাঘটা, হুঙ্কার ছাড়ছে। সুবিধে করতে না পেরে বুড়িকে নামিয়ে রেখে গুণ্ডার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাইফেলটা কাঁধে তুলেই গুলি করল রানা। এক কান দিয়ে ঢুকে বাঘের অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল গরম সীসা। প্রকাণ্ড একটা লাফ দিয়ে ছ'সাত হাত ওপরে উঠে গেল বাঘটা, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়েই স্থির হয়ে গেল। এক দৌড়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে দেখছে বুড়িটা ওকে।

বুড়িকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ফিরে এল রানা। পেছনে হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাঁফাতে হাঁফাতে খুশিমনে আসছে গুণ্ডা। প্রবল বেগে দুলছে লেজ। জঙ্গল থেকে বেরিয়েই দেখতে পেল রানা, আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে হন্তদন্ত হয়ে এইদিকে আসছে মিরহাম, রানার কোলে জ্যান্ত বুড়িকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির হয়ে।

বুড়িকে আগুনের পাশে নামিয়ে দিল রানা। মাটিতে পা পড়তেই ঠাস্ করে একটা চড় লাগাল বুড়ি রানার গালে। বিচিত্র ভাষায় কি বলছে কিছুই বোঝা গেল না।

বোকার মত চেয়ে রইল রানা।

গজর গজর করতে করতে বুড়ি চলে গেল একধারে। একটা মরা-গাছের কাণ্ডের ওপর গুছিয়ে বসে দুর্বোধ্য প্রলাপের সঙ্গে ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে কাঁদতে শুরু করল। ছুটে এল যুবতী দুজন। বুড়ির বাম বাহুর ক্ষতস্থানে ছাইয়ের প্রলেপ লাগাচ্ছে ওরা।

গুণ্ডার মাথায় কয়েকটা চাপড় দিয়ে আদর করল রানা, তারপর এগিয়ে গিয়ে রাইফেলটা গুঁজে দিল তারু তাকুনের হাতে।

মরা বাঘটাকে তুলে নিয়ে আসবার হুকুম দিল মিরহাম। ছাল ছাড়িয়ে নেয়া হবে ওটার। সিকুবা আ, ওয়াকলাই আর কৃতজার চলে গেল সেই কাজে। শিরিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। একটা পাইপ ধরিয়ে বড় একখণ্ড পাথরের ওপর আনমনে বসে ছিল চম্মা মং, রানার দিকে চেয়ে মৃচকি হাসল। মিরহাম এসে দাঁড়াল রানার পাশে।

'যা বলছিলাম,' আচমকা বাঘের আক্রমণে যে কথাটা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল সেই কথার খেই ধরল মিরহাম, 'পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ দেয়া হবে না তোমাকে। এখন থেকে আলাদা থাকবে তোমরা দুজন। তোমার মেয়েমানুষের ওপর সব সময় চোখ রাখবে আমার মা-বোন।'

'মা-বোন?' অবাক হলো রানা। 'কোথায় তারা?'

আঙুল তুলে বুড়িকে দেখাল মিরহাম।

'ওইটা আমার মা। আর ওই যে ছুঁড়িটা, দু'চোখ দিয়ে গিলছে তোমাকে—ও আমার বোন। প্রাণ বাঁচিয়েছ বলে কোন সুবিধা পাবে না তুমি বুড়ির কাছে। প্রেমে পড়েছে বলেও কোন সুবিধা পাবে না তুমি ছুঁড়ির কাছে। মনে রেখো, রক্তের টান বড় গভীর টান। আমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র খুন করবে ওরা তোমার মেয়েমানুষকে।'

মন্তব্য করল না রানা। মিরহামের ইঙ্গিতে চলে গেল শিরিন মেয়েদের কাছে। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করছে ওরা।

মরা বাঘটা কাঁধে তুলে নিয়ে এল সিকুবা আ। পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না চামড়া ছাড়িয়ে নিতে। হাড়-মাংস টুকরো টুকরো করে জঙ্গলে রেখে আসা হলো বনদেবতা খুজিং-এর ভোজ হিসেবে।

খাওয়াদাওয়ার পর দু'পক্ষের চুক্তি সম্পর্কে আরও কিছু আলাপ হলো। রানা ও শিরিনকে জায়গা দেয়া হলো আলাদা আলাদা তাঁবুতে। সারারাত প্রহরার ব্যবস্থা করেও রানার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না মিরহাম। হাত-পা বেঁধে দেয়া হলো ওর। ব্যাপারটা নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করল না রানা।

অন্ধকারে পাহারা দিচ্ছে সিকুবা আ। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। রানার দু'পাশে দু'জন শুয়ে আছে, এ-পাশ ও-পাশ করছে মাঝে-মধ্যে। ঘোড়াগুলো পা ঠুকছে মাটিতে। মৃদু, মেয়েলি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। গান গাইছে

কেউ। আশপাশের কোন তাঁবু থেকে আসছে। বুড়িটা নয়। মিষ্টি লাগছে গলাটা। সেই নাকবোঁচা যুবতী মেয়েটা বুঝি। মিরহামের বোন।

মেয়েটার কথা মনে পড়তে, অস্বস্তি অনুভব করল রানা। যতবার তাকিয়েছে ও, দেখেছে, ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা একদৃষ্টিতে। লজ্জা শরমের বালাই নেই।

ঘুমপাড়ানি গানের মত একঘেয়ে মিষ্টি সুর। শুনলেই বোঝা যায় হাজার বছর আগে বেঁধেছিল কেউ ওই গান।

গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম ভাঙতে তাঁবুতে কাউকে দেখল না রানা। হাত-পায়ের বাঁধন কখন খুলে দেয়া হয়েছে টের পায়নি সে। ফাঁক-ফোকর দিয়ে ধবধবে রোদ ঢুকেছে। তাঁবুর অদূরে কিছু ভাজা হচ্ছে, তার শব্দ আর গন্ধ আসছে। মাথা নিচু করে বাইরে বেরিয়ে যা ভেবেছিল, তাই দেখল রানা। বুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই, তাঁবুগুলোও গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। মালবাহী ঘোড়া দুটো ছাড়া আর একটা ঘোড়ার ছায়া পর্যন্ত নেই।

বুড়ি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানাকে। ভেংচি কাটবে মনে করে চোখ সরিয়ে নিল রানা তাড়াতাড়ি। গতরাতের চড়ের কথা ভোলেনি সে। মেজাজী বুড়ি।

'আমার দিকে চাইতে ইচ্ছা হবে কেন···ছুঁড়ি হলে খুব মজা লাগত, না?'

রানা দেখল, বুড়ি দুই কোমরে হাত রেখে ওর দিকে চেয়ে হাসছে।

'কতক্ষণ নাস্তা গরম রাখব? রাজপুত্তুর! জলদি মুখ ধুয়ে এসো!' কর্কশ গলায় হাঁক ছাড়ল বুড়ি।

এদিক ওদিক চেয়ে পানি ভরা একটা বালতি দেখতে পেল রানা। চটপট হাত মুখ ধুয়ে চলে এল বুড়ির পাশে। বসে পড়ল মাটিতে।

একটা থালায় গোটা চারেক গমের আটার রুটি, পোয়াটেক বিচিত্র সুস্বাদু হালুয়া, কিছু ছাড়ানো বাদাম, আর এক মগ গরম চা এগিয়ে দিল বুড়ি।

যতটুকু পারল খেয়ে নিল রানা ভয়ে ভয়ে। খাওয়া থামলেই চোখ রাঙায় বুড়ি। কান খালি পেয়ে অনর্গল আবোলতাবোল বকে চলেছে সে আপন মনে, রানার জবাবের পরোয়া না-রেখেই। কিন্তু লক্ষ করল রানা বুড়ি মিরহাম বা শিরিনের প্রসঙ্গ তুলছে না একবারও।

'এই বয়সে এত খাটতে পারো?' বুড়ির মন কাড়ার জন্যে বলল রানা। বিপদেই পড়ল। বুড়ি শুরু করল নিজের জীবনের, ছেলেবেলার প্যাচাল গাইতে। শিরিনের ভাল মন্দের কথা ভেবে অস্থিরতা বাড়ছে রানার। বুড়ি রড়ি আফার প্রসঙ্গে কিছু বলছিল, ঠিক শুনতে না পেলেও, নামটা কানে গেল।

'কেউ হয় নাকি তোমার?'

'তুমি শালা কালা নাকি?' বুড়ি মারমুখো হয়ে উঠল, 'এতক্ষণ কি শুনলে? রড়ি আফা আমার বেরাদার। রড়ি শামানও আমার বেরাদার।' চোখ ভরে উঠল বুড়ির পানিতে। 'চার কুড়ি দশ বছরের বুড়ো ভাই আমার, তার জন্যে কত কি না করেছি আমি। তুমি বুঝবে না। যখন সে অসুখে পড়ল, বললাম,

'জানো না তুমি থাম্পা মন্দিরের রহস্য?' বলল, 'জানি।' বললাম, 'আমাকে বলো।' বলল না। বলতে চাইল না। অসুখ বাড়ল, মরে মরে তবু বলল না। জাতির পবিত্র মন্দির, কোথায় সেটা জানতে কার না সাধ হয়? মদ খেলাম—খাব না কেন? মাতাল হলাম, বেরাদারের পায়ের ওপর আছাড় খেলাম। রাজি হলো না...' বুড়ি হঠাৎ চুপ করে গেল, চেয়ে রইল রানার দিকে, 'জানো, কেন বলছি এত কথা?'

'না, জানি না।'

'প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি রাতে?' বুড়ি বলল।

'খুশি হয়েছিলে বলে তো মনে হয়নি।'

'রাগ হবে না কেন, রাজপুত্তুর? আপন লোক কেউ গেল না। রাগ তাদের ওপর। মনে দুঃখ। তোমাকে মারলাম। বুঝলে না?'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'বুঝেছি। আচ্ছা, এরা সবাই গেছে কোথায়?'

'চিন্তা না করো, রাজপুত্তুর।' বুড়ি আশ্বাস দিল, 'সিকুবা আ আর তারু তাকুনকে নিয়ে গেছে মিরহাম। চম্রা, ওয়াকলাই আর কৃতজার যে পথে ফিরবে সেই পথে লুকিয়ে থাকবে ওরা। দেখবে কে কে আসছে। কতজন আসছে। উচা হ্লা-কে নিয়ে গেছে, সে তোমার ওপর চোখ দিয়েছে। ওকে বিশ্বাস নাই।'

রানার মুখে কথা জোগাল না।

'উচা হ্লা তোমাকে নাঙ্গা করার চেষ্টা করবে ভেবে মিরহাম সঙ্গে নিয়ে গেছে তাকে। নেরানব্বইটা মরদ লাগে ওর। থোঃ থোঃ।' থুথু ফেলল বুড়ি ঘৃণাভরে। 'তোমার ছুঁড়িটাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। তার কারণ আমি জানি না।' হিহ্ হিহ্ করে হাসল বুড়ি, 'ভয় নাই, তার ওপর নিজেও চড়াও হবে না, কাউকে চড়াও হতেও দেবে না মিরহাম। তবে, ফিরে আসবে কিনা আমি জানি না। যদি বেত্তোমিজী করে, মেরে ফেলবে মিরহাম। ভাল লোক, ওই মিরহাম। মেরে ফেলার সময় কষ্ট না দেয়।'

'মিরহাম ভাল লোক?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'না ভাল? স্বীকার যাই...' কি স্বীকার করে বলল না বুড়ি, 'তবু, ভাল লোক!'

'থাক।' বলল রানা, 'তুমি বরং তোমাদের লালপাহাড় আর থাম্পা মন্দিরের গল্প বলো।'

ইনিয়ে বিনিয়ে হাজার গল্প শুরু করল বুড়ি। মো আ, মানে গাভী—তার নাম। হেন তেন। রড়ি শামান, মো আর ভাই, তার সম্পর্কে বলল অনেক কথা। সবাই, সব গোষ্ঠির লোক জানত শামান মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র মন্দিরে যাবার রাস্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র রড়ি শামানই পথের রহস্য জানত। সে জেনেছিল তার বাপের কাছ থেকে, তার বাপ জেনেছিল তার বাপের কাছ থেকে। এইভাবে চলে আসছে পথের নিশানা। সবাই ধরে নিয়েছিল রড়ি শামান কোন মানুষকে নয়, সাগরকে বলে গেছে পবিত্র মন্দিরে যাবার রহস্য। নিয়মও তাই। বিশ্বস্ত লোক গোষ্ঠির মধ্যে পাওয়া না গেলে

মরার আগে বলে যেতে হবে সাগরকে। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। কেউ সঠিক চিনতে পারেনি রড়ি শামানকে! পবিত্র মন্দিরে পৌছুবার রহস্য সে বলে গিয়েছিল রড়ি আঁফাকে।

রড়ি আঁফা স্বীকার করেনি কোনদিন। কারণ, মানুষ লোভী হয়ে উঠেছে। আজকালকার মানুষকে বিশ্বাস নেই। তার মানে, রড়ি শামানের মৃত্যুর পর আজ পর্যন্ত থাম্পা মন্দিরে যায়নি কেউ। নরবলি দেয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে যাবার। পূজা এবং নরবলি, দুটোই বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, আজকালকার মানুষ হয়ে গেছে অসৎ। নিয়ম ছিল, যারা যাবে তাদের চোখ বেঁধে দেয়া হবে। দলপতির হাতে থাকবে একটা দড়ির প্রান্ত। সেই দড়ি ধরে সবাই অনুসরণ করবে তাকে। কিন্তু রড়ি আঁফার ভয় ছিল, আজকালকার মগদের নিয়ে গেলে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ লুকিয়ে দেখবে, যাতে পরে একা গিয়ে হজম করতে পারে রুবি আর দেবতার তৃতীয় নয়ন। রড়ি আঁফা চেষ্টাই করেনি সেখানে যাবার।

রহস্যটা সে জানে একথা স্বীকারও করেনি রড়ি আঁফা কারও কাছে। পাছে অত্যাচার হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কাউকে কিছু না জানিয়ে রওনা হয়ে গেল সে পশ্চিম দিকে।

'সবাই জানল কি করে তা হলে?'

'খবরদার! কথার মধ্যে কথা বলবে না!'

চোখ রাঙাল বুড়ি, তারপর মগ্ন হয়ে গেল নিজের গল্পে।

লোকটা সাগরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তেই সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। শুধু মার্মাদের এক কুড়ি গোষ্ঠির মধ্যেই নয়, দশটা প্রধান উপজাতির মধ্যে তীব্র আলোড়ন দেখা দিল।

সবাই টের পেল, রড়ি আঁফা জানে। সাজ সাজ রব পড়ে গেল চারদিকে।

এরপর মিরহামের প্রসঙ্গ তুলল মো আ।

মিরহামের বাবা ছিল দুর্ধর্ষ এক পাখো। ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছিল সে মো আকে ওর রূপের আকর্ষণে। জন্ম হয়েছিল মিরহামের। মিরহামের বাবা আরও একটা বিয়ে করেছিল। সে মেয়েটা ছিল চীনা, ডাকাতি করে এনেছিল সুদূর চীন সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে। সে-ও রূপেরই মোহে। ডাকাতের ছেলে মিরহাম ডাকাতই হয়েছে। চীনা স্ত্রীর গর্ভে একটি মাত্র কন্যা সন্তান হয়। উচা হ্লা হলো সেই মেয়ে। মায়ের রূপ পেয়েছে ছুঁড়িটা, স্বভাব পেয়েছে বাপের।

রড়ি আঁফা নিরুদ্দেশ হয়েছে, এ খবর পাওয়া মাত্র মিরহাম সীমান্ত এলাকা থেকে রওনা দেয়। সাথে চুচ্যাং তাগল। পথে তার দলে যোগ দেয় ওয়াকলাই, কুতজার আর তারু তাকুন। এরা প্রত্যেকে বিভিন্ন উপজাতির বাছাই করা প্রতিনিধি। এদের পাঠানো হয়েছে বুড়োর কাছ থেকে পবিত্র মন্দিরের পথের নিশানা আদায় করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করে দেখতে।

'সব গোত্রের সবাই এই মন্দির সম্পর্কে জানল কি করে? সত্যিই এরকম কোন মন্দির আছে কিনা...'

'না জানবে কেন? সব গোত্রেই এমন কেউ না কেউ আছে যে নিজের

চোখে দেখে এসেছে থাম্পা মন্দিরের লাল দেবতা। চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে রড়ি শামান, ফেরৎ এনেছে চোখ বেঁধে। পথের নিশানা রয়েছে কেবল আমাদের গোষ্ঠির কাছে। তাই সোজা আমার কাছে চলে এসেছে মিরহাম সবাইকে নিয়ে। রড়ি আঁফা কোন্ পথে গেছে জানতে চাইল। বললাম না। মারল। খুব মারল। শেষে বলে দিলাম। রওনা হলো সেই পথ ধরে। পথে দেখা হলো চম্মা মং আর সিকুবা আ-র সঙ্গে। তারাও চলল।'

'মেয়েদের সঙ্গে নেয়ার কি উদ্দেশ্য?' জানতে চাইল রানা।

'রাঁধবে কে? তাছাড়া চুচ্যাংকে বশে রাখতে হলে মেয়েমানুষ লাগবে না? আপ্রোমাকে কেনা হয়েছে তাই। নগদ দশটা রাইফেলের গুলি আর কোমরের একটা বেল্ট দিয়ে কিনেছে ওকে মিরহাম। উচা হলা এসেছে আমার সঙ্গে। আমার কাছেই ছিল ও বাপ মরার পর থেকে। সতীনের মেয়ে—কিন্তু মায়া বসে গেছে হারামজাদি ছুঁড়ির ওপর। আমারই মতন নেরানব্বইটা পুরুষ লাগে ওর বচ্ছরে।'

'তোমারও এত পুরুষ লাগে নাকি!' কপালে উঠল রানার চোখ।

'লাগত।' হাসল বুড়ি। 'বয়সটা তিন কুড়ি বছর কম হলে তোমাকে ছেড়ে দিতাম মনে করেছ, রাজপুত্তুর? কিন্তু না···অনেক বক বক্ হয়েছে। উঠে পড়ো··· বেঁধে থুই আবার। ছাড়া দেখলে মেরে আমার পিঠের ছাল তুলে নেবে মিরহাম।'

মোটা একটা চুরুট ধরিয়ে এগিয়ে দিল মো আ রানার দিকে। তাঁবুর ভিতর চলে এল রানা। ওর হাত-পা কষে বেঁধে রেখে নিজের কাজে চলে গেল বুড়ি। কাজ করছে; আর গজর গজর করছে আপন মনে।

পাঁচ

অপেক্ষা করা ছাড়া কাজ নেই—সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে তন্দ্রামত ভাব এসে গেল রানার চোখে। সজাগ হলো মানুষের কথাবার্তার শব্দ কানে যেতেই। আওয়াজ যেদিক থেকে আসছে সেই দিকে ঘাড় ফেরাল রানা, তাঁবুর একটা ফাঁক দিয়ে দেখা গেল আগুনের কাছেই একটা পাথরের ওপর বসে আছে মিরহাম। খেতে দিচ্ছে ওকে মো আ। আগুনের অপর প্রান্তে হাঁটু মুড়ে, হাঁটুর ওপর গাল রেখে জঙ্গলের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে শিরিন। মিরহাম বলছে, 'বিপদেই পড়া গেল এই মেয়েলোকটাকে নিয়ে।'

'কেন? কি হলো আবার?' জিজ্ঞেস করল মো আ।

'কোন কষ্ট সহ্য হয় না ভেনার। ক্ষতি করা যায় না, বিগড়ে যাবে রানা; ছেড়ে দেয়া যায় না, ভেগে যাবে লোকটা। কি যে করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। একে নিয়ে অতদূর যাব কি করে?'

'দূরের কথা ভাবা যাবে। সব ঠিক করে নেব আমি। এখন সিকুবার ক'

ধর।' মো আ গ্রীবা নাড়িয়ে বাঁ দিকে ইঙ্গিত করল, 'কি করবি এই সাক্ষাৎ যমকে নিয়ে? খাঁটি মার্মা ওরা। বিশ্বাস নাই। আমি বিশ্বাস করি না ওদেরকে।'

'আমিও।' মিরহাম বলল, 'ভয় চম্মা মংকে। মাথার ভিতর অনেক জ্ঞান? সিকুবা একটা ছাগল।'

'হ্যাঁ দেখছি, রানার ন্-বুরহে ওর ধারে কাছে সদা ঘেঁষে রয়েছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দূরে গাছের ছায়ায় বসে আছে সিকুবা আ। প্রকাণ্ড একটা পাহাড় যেন।।

'জানোয়ার দু'জন চিনেছে দু'জনকে।' মিরহাম বলল।

গুণ্ডাকে দেখল রানা, খেলা করছে সিকুবার সঙ্গে। রড়ি আঁফার লাশটাও রয়েছে পাশে।

'লাশের কি ব্যবস্থা? গন্ধ ছুটবে কাল থেকে। টিকতে পারবি না।'

'লাশটা ফেলবে না সিকুবা!' মিরহাম বলল, 'চম্মা মং ফিরলে ও চলে যাবে তোদের গ্রামে। আমরা ওর জন্যে অপেক্ষা করি বা না করি।'

'মন্দ।'

'আমিও বলি।'

মো আ বলল, 'ফিরে গেলে, বিপদ হবে। দুনিয়া জানবে, আমরা মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। মিরহাম, বলি শেষ করে দে ঝামেলা। রাইফেলটা এদিকে দে দেখি?'

'কি করতে চাস? খুন করবি সিকুবাকে?'

'করব না? ছাগল নাই। একে সঙ্গে নিয়ে সব সময় ভয়ে মরবি। তার চেয়ে আগে...'

'চম্মা মংয়ের কি হবে?'

'মরণ।'

মিরহাম বলল, 'দূর হ, হারামজাদি। ওদের গোষ্ঠিকে চিনিস না তুই? জানিস না কি শক্তি ধরে ওরা? জানে তারা, শামানের গোষ্ঠির কাছে এসেছে ওরা দু'জন মন্দিরের নকশা নিতে। শুনবে না তারা আমার সঙ্গে রওনা হয়েছে ওরা দু'জন? ওরা খুন হলে তুফান বইয়ে দেবে ওরা, জ্যান্ত-কবর না দিয়ে ছাড়বে না আমাকে। ওদের সঙ্গে বিবাদ মানে গজব।'

'মানি না।'

'চুপ থাক!' মিরহাম বলল, 'আমি এখন ভাবতে বসব। তুই চুপ থাক।'

চুপ করে গেল মো আ। মিরহাম গালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করল। তার দিকে পেছন ফিরে বসল মো আ। ভাবছে সে-ও। ভাবছে রানাও। শিরিনও।

তারু তাকুনের ঘাবড়ে যাওয়া চেহারা। ঘাবড়ে গেলে, যা সে করে, ঘনঘন জিভ বের করে ঘা চাটছে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে মিরহাম, গম্ভীরভাবে পায়চারি করছে। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার।

আগুনের কাছে এসে বসেছে সিকুবা আ। উদ্বেগহীন, নির্বিকার। গুণ্ডার

সঙ্গে খেলা করছে সে।

মিরহামের ধারণা অনুযায়ী, কয়েক ঘন্টা আগেই ফিরে আসার কথা চম্না মং-দের। লক্ষণ দেখে সন্দেহ হচ্ছে, এ জীবনে ফিরবে না আর।

পেট ফুলে উঠেছে রডি আঁফার। বাতাসে দুর্গন্ধ।

বন্ধন-মুক্ত রানা বসেছে সিকুবার মুখোমুখি, আগুনের অপর দিকে। পাশে বসেছিল শিরিন, এখন সে মিরহামের হুকুমে সরে বসেছে কয়েক হাত দূরে। তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে রানার দিক চেয়ে রয়েছে উচা হ্লা।

অস্বস্তি বোধ করছে সবাই।

রানার সামনে থামল মিরহাম, 'আমার লোকেরা যদি না ফেরে? আলোচনা দরকার। চুক্তিতে আসতে চাই আমি।'

'দরকার নেই।' বলল রানা, 'আলোচনা করে যে চুক্তি হবে, সেটা যখন খুশি ভাঙবে তুমি। পরিস্থিতি তোমার অনুকূলে, তুমি যা বলবে, তাই হবে।'

'না, রানা।' কর্কশ কণ্ঠস্বর খাদে নামাল মিরহাম, 'তোমার বন্ধুত্ব চাই আমি।'

আকাশের দিকে তাকাল রানা।

'কি দেখছ?'

'দেখছি বুদ্ধদেব স্বর্গ থেকে আলোকরশ্মি পাঠাচ্ছেন কিনা!'

'তারমানে, মিথ্যে কথা বলছি আমি?' গরম হয়ে জানতে চাইল মিরহাম।

'হ্যাঁ। তাতে কোনই সন্দেহ নেই আমার।'

'ঠিক আছে, আমরা দু'জনেই লোভী কুত্তা।' সুর নামিয়ে বলল মিরহাম, 'পবিত্র মন্দিরের রুবি চাই, ঠিক? এই অভিযানে দুশমন না, আমরা বন্ধু—মানো? ভেবে দেখো রানা, তোমাকে খুন করা উচিত ছিল তবু আমি খুন করিনি।'

'কারণটা বলব?'

'খুব একগুঁয়ে লোক তুমি রানা। কিন্তু...'

রানা বলল, 'কিন্তু ভয়ও আবার কম পাই।'

'শোনো আমি কি ভেবেছি বলি...'

ভাবনার ফসল প্রকাশের সুযোগ পেল না মিরহাম। একটা বনমোরগ ডেকে উঠল কোথাও।

বিদ্যুৎ খেলে গেল তিনজনের শরীরে! আগুনের কাছে পড়ে ছিল বড়সড় একটা তক্তা। সেটার দু'দিকে ছুটে গেল একযোগে মিরহাম ও মো আ। পানি ভর্তি একটা কলস তুলে নিল তারু তাকুন সবেগে।

আগুনে পানি ঢালল তারু তাকুন। মো আ আর মিরহাম চওড়া তক্তাটা চাপিয়ে দিল পরমুহূর্তে আগুনের ওপর। দশ সেকেন্ডের মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা।

'কি হয়েছে?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল রানা।

'চম্না মং সঙ্কেত দিচ্ছে।' মিরহাম উত্তেজিত। 'কথা বোলো না। নড়াচড়া কোরো না। বিপদের সঙ্কেত ওটা।'

আরও কয়েকবার বন-মোরগের ডাক শোনা গেল। কাছে চলে আসছে আওয়াজটা। শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল, সবার চোখ সেদিকে নিবদ্ধ।

কিন্তু চম্রা মং এল চুপিসারে, সকলের পেছন দিক থেকে।

'বিপদ!' ঘোষণা করল সে ঘোড়া থেকে নামতে নামতে। 'আমরা উত্তরে যাব জানাজানি হয়ে গেছে।'

চারদিক থেকে সবাই এগিয়ে গিয়ে ঘিরে দাঁড়াল চম্রা মংকে।

'মানে?'

'উত্তরের গিরিপথে ক্যাম্প করেছে পুলিস। মাইজ চাপাহ হেড কনস্টেবল। তার সঙ্গে মুরং আরও কয়েকজন। আরও বড় একটা দলকে হুঁশিয়ারি-সঙ্কেত পাঠানো হয়েছে। তারা রয়েছে পেছনের ক্যাম্পে।'

'বাঙালি পুলিস?'

'বাঙালি। তোমার খবর পেয়েছে ওরা।'

'গিরিপথে সবকটাই মুরং?'

'হ্যাঁ।' চম্রা মং বলল, 'সেখান থেকে আগুনের আলো দেখা যেতে পারে ভয় হলো, তাই সঙ্কেত দিচ্ছিলাম।'

থমথম করছে মিরহামের মুখ, 'বিপদটা কঠিন। গিরিপথ ছাড়া যেতে পারব না। উপায়?' রানার দিকে তাকাল সে।

চম্রা মং দু'হাত ভাঁজ করল বুকের ওপর। 'রামু থেকে লোক এসেছে। অনুমতি দিলে আনতে পারি এখানে।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মিরহাম, 'কি? এসেছে তারা? এতক্ষণ বলোনি কেন?'

'জিজ্ঞেস করেছ আমাকে?' চম্রা মং বলল, 'বেশি লোক পাওয়া যায়নি। জামান, আর আরও দু'জন। আসবে এখানে?'

'আসবে।' মিরহাম অনুমতি দিল। চম্রা মং জঙ্গলে প্রবেশ করতে মো আ-কে বলল সে, 'ছোট করে আগুন জ্বালো।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বুড়ি মো আ বলল, 'মিরহাম, রড়ির লাশ যদি সূর্য ওঠার আগে কবর না হয়, গুলি করব আমি সিকুবাকে।'

দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠেছে ইতোমধ্যে।

'তোমার সঙ্গে আছি।' তারু তাকুন বলল, মিরহাম তাকিয়ে আছে দেখে জিভটা বের করতে গিয়েও করল না।

'চুপ যা দু'জনেই!' হুকুম দিল মিরহাম, 'আমি রানার সঙ্গে কথা বলব।'

নরম গলায় বলল তারু তাকুন, 'ঠিক আছে, মিরহাম, তুমি কথা বলো। আমি চুপ গেলাম।'

অকস্মাৎ গলা একেবারে নামিয়ে এনে মিরহাম বলল, 'চম্রা মং বেঈমানী করতে পারে। ধরো, জামান সাহেবের দল না এনে মার্মাদের একটা দল নিয়ে এল চম্রা মং?'

চেয়ে রইল রানা।

'চম্মা মংকে চিনি আমি। ও পারে। খুব পারে।' মিরহাম কোমর থেকে বের করল রিভলভারটা, ইঙ্গিত করল তারু তাকুনকে। রাইফেল তুলল সে।

'না দেখে গুলি করা কিন্তুক উচিত হবে না।' বলল তারু তাকুন।

'চোপরাও, কুত্তার বাচ্চা! না দেখে, লাভ-লোকসান হিসেব না করে গুলি কখনও করেছি আমি?'

'তুমিই জানো!' নিচু গলায় তারু তাকুন বলল, 'চুপ! ও আসছে!'

আগুনকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে মিরহাম, তারু তাকুন, রানা। রানার বাঁ দিকে মো আ, হাতে রাইফেল।

জঙ্গল থেকে বেরুল প্রথমে ওয়াকলাই। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। তার পেছনে আখতারুজ্জামান। দৃঢ়, লম্বা পা ফেলে ওয়াকলাইকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসছে সে। তার পেছনে আরও দুজন প্যান্ট পরা বাঙালি লোক। চম্মা মং আর কুতজার সবার পেছনে রাইফেল হাতে।

কারও মুখে টুঁ শব্দ নেই। রানার সামনে এসে থামল জামান। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চারদিকে তাকাল। শিরিন কাওসারকে দেখল দলছাড়া হয়ে এক ধারে বসে থাকতে। রাইফেলটা বাম হাত থেকে ডান হাতে নিল জামান।

'আচ্ছা! এরাই বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে তাহলে।' কথাটা বলে ফিরল রানার দিকে। 'ব্যাপার কি রানা? এসব কি? আমি··· আমি···'

'শান্ত হও।' বলল রানা, 'এদিকে এসো, বুঝিয়ে দিচ্ছি সব।' কয়েক পা সরে গিয়ে সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিল রানা। শুনতে শুনতে ছানাবড়া হয়ে উঠল জামানের দুই চোখ। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা।

'সত্যিকার নকশা? তোমার কাছে? বলো কি, রানা!'

'কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আটকে ফেলেছে এরা। পড়ে গিয়েছি বেকায়দায়। আমি একা হলে কোন কথাই ছিল না, কিন্তু মুশকিল হয়েছে শিরিনকে নিয়ে। সে জন্যেই তোমার সাহায্য দরকার হয়ে পড়েছে।'

'হলো তোমাদের কথা?' মিরহাম এসে দাঁড়াল রানার পাশে। 'এবার এসো, আলোচনা করতে হবে। গিরিপথ পাহারা দিচ্ছে পুলিস। কিভাবে এগোবে উত্তরে?'

'ওদেরকে খেয়ে ফেললেই তো ঝামেলা চুকে যায়।' তারু তাকুন বলল, 'সে ব্যবস্থাই করো না কেন? লালপাহাড়ে কেউ না গেলে আমি যাব, আমি না গেলে আমার আত্মা যাবে।'

'ঠিক।' গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল চম্মা মং।

ওয়াকলাই দু'বার কিছু বলতে গিয়েও বলেনি। এবার সে নিজেকে দমন করতে পারল না। 'পবিত্র মন্দির? ফুস্! আমি যাব না। আমি ফিরে যাব।'

তর্জনী তুলে হুঁশিয়ার করে দিল মিরহাম, 'সাবধান, ওয়াকলাই!'

জ্বল জ্বল করছে হিংস্র ওয়াকলাইয়ের চোখ।

'ব্যাটা লুটপাট করতে না পেরে পাগল হয়ে গেছে!' চম্মা মং ফিস ফিস করে বলল।

'থাম্পা মন্দিরের গল্প বিশ্বাস করি না আমি।' মুরং ওয়াকলাই দৃঢ় কণ্ঠে

জানাল, 'দলে যোগ দেবার সময়ই বলেছিলাম, আমার ইচ্ছা আমার। আমার ইচ্ছা আমি যাব না কোথাও। নিজের গ্রামে ফিরব আমি।'

'মাথা এমনিতেই গরম আছে, ওয়াকলাই। ঝামেলা বাড়াস না।'

'না।' চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে দূরে, 'ভাল লাগে না তোমাদের সঙ্গ। আমি যাচ্ছি। বিদায়।'

নিজের ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল ওয়াকলাই।

মিরহাম আর কথা বাড়াল না। বসে ছিল বসেই রইল।

ওয়াকলাই নিজেই দাঁড়াল, 'তোমার সঙ্গে বিবাদ নাই, মিরহাম। এইসব বাঙালিদের বিশ্বাস করি না!' এগোল আবার।

'ওয়াকলাই!'

মিরহামের নরম কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়াল গম্ভীর ওয়াকলাই, 'বলো।'

'বিদায়।' শান্ত স্বরে বলল মিরহাম। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল তার হাতের রিভলভার।

কপালের মাঝখানে ফুটো হয়ে গেছে ওয়াকলাইয়ের। ফুটোটা লাল হয়ে ওঠার আগেই পড়ে গেল সে সশব্দে। স্থির হয়ে গেল দেহটা।

নিস্তব্ধতা নামল।

'মিছামিছি গুলি খরচ করা ঠিক নয়।' বলল মিরহাম, 'কিন্তু কি আর করা!'

রানা বলল, 'পুলিসদের কানে গেছে গুলির আওয়াজ।'

'জানি।' হাসল মিরহাম, 'শব্দ পেয়ে ওরা ভাববে, আমরা এখনও এই জঙ্গলে আছি। সুতরাং গিরিপথের ওপর চোখ রেখে বসে থাকবে ওরা। এক বিন্দু নড়বে না, ভুলেও তাকাবে না অন্য দিকে। আমরা কি করব? আমরা পাহাড়ে চড়ব। পাহাড় ডিঙিয়ে দূরে চলে যাব। লাথি মারি গিরিপথে।'

মাটির ওপর পা ঠুকল মিরহাম।

'খুন করা তোমার পেশা, জানতাম, মিরহাম।' জামান বলল, 'কিন্তু, নিজের লোকদেরও তুমি এভাবে মশা-মাছির মত কারণে অকারণে খুন করবে ভাবতে পারি না।'

'ওয়াকলাই আমার নিজের লোক?' হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল মিরহাম, 'না, সাহেব! ওয়াকলাই একজন মুরং। মাইজ চাপাহ-ও একজন মুরং। জানো সে কথা?'

জামান কথা বলল না।

'মাইজ চাপাহ হেড কনস্টেবল। ওয়াকলাই তার সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছিল।' মিরহাম বলল, 'এখন বলো তোমরা, কাজটা ভাল করেছি কিনা?'

কেউ কোন কথা বলল না।

'যাই হোক,' আবার বলল মিরহাম, 'আমার কাজের কৈফিয়ৎ আমি কাউকে দেব না! আমার খুশিতে চলব আমি, যা ইচ্ছা তাই করব। ধার ধারি না কারও। কাজের কথা বলো এখন। আলোচনা হবে, কি হবে না?'

জামান তাকাল রানার দিকে। ইঙ্গিত পেয়ে বলল, 'হবে!'

'ব্যস!' মিরহাম বলল, 'এখন ঠিক হোক, কে যাবে কে যাবে না। রানা,

দলে তোমরা পাঁচজন। আমরা চারজন।'

'পাঁচজন?'

'জামান, তার সঙ্গে দু'জন, এই হলো তিনজন।' মিরহাম স্কার্ফের পকেটে রিভলভারটা রাখতে রাখতে বলল, 'আর তোমরা দু'জন।'

'আমি আর শিরিন। কিন্তু কথা ছিল, মেয়েদের গোণার মধ্যে ধরা হবে না। তোমার দলে তো মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে দস্যু-সর্দার মিরহাম বলল, 'আমি মেয়েদের কথা বলিনি। আমি তোমার খ-ই-এর কথা বলছি।'—খ-ই মানে কুকুর।

চেয়ে রইল রানা, 'তার মানে?'

'আমরা শিকারী, মানো?'

'কিন্তু তাতে কি?'

'তোমার কুকুরও শিকারী, মানো?'

রানা বলল, 'কুকুরটাকেও তুমি গুনবে? ওকে কি তুমি লুটের ভাগ দেবে?'

'ভাগাভাগির কথা পরে।' গম্ভীর মিরহাম। 'এখন আলোচনা হচ্ছে কে যাবে কে যাবে না তাই নিয়ে। আমরা চারজন। তোমরা পাঁচজন।'

রানা বলল, 'আমি তো দেখছি তোমরাও পাঁচজন।'

'সিকুবা বড়ি আঁফার লাশ নিয়ে শামানের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।'

'শোনো, মিরহাম।' চমা মং বলল, 'তোমাকে আবার গুনতে হবে।'

'কি? আবার গুনতে হবে কেন?'

'সিকুবা শামানের গ্রামে ফিরছে না। পবিত্র মন্দিরে যাবে ও।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল চমা মং। দলপতির কথার বিরুদ্ধে কথা বলা মানে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা, জানে সে।

দু'জন চেয়ে রইল দু'জনের দিকে।

'কিন্তু সিকুবা নিজেই বলেছে, সে শামানের গ্রামে লাশ নিয়ে যাবে।'

'সিকুবা বাচ্চা, ওর মাথায় অবোধ শিশুর বুদ্ধি। আমিই ওর হয়ে কথা বলি। আমাকে জিজ্ঞেস করো।'

'তাহলে সিকুবাকে যেতে দেবে না লাশ নিয়ে?'

'না।'

'কেন?'

'সে কথা বলব না।'

'এই তোমার শেষ কথা?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল মিরহামের।

'নির্ভর করে।'

'কিসের ওপর?'

'কোমর থেকে অস্ত্রটা তুমি বের করবে কি করবে না তার ওপর।' মিরহাম পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেদিকে চোখ রেখে বলল চমা মং।

বোঝা গেল চমা মংকে খুন করার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে গেছে মিরহাম। কিন্তু খটকা লাগছে তার, কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে। এত সাহস কোত্থেকে পেল হঠাৎ চমা মং?

খুব বেশি ভয় পেলে যা হয়, তারু তাকুন ঘা চাটতে ভুলে গিয়ে চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে মিরহামের পেছন দিকে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে, মিরহামের মৃত্যু ঘটবে আজ।

গলা শুকিয়ে গেছে কুতজারেরও, ঢোক গিলছে সে ঘনঘন।

'কি বলতে চাইছ?'

'খালি হাত পকেট থেকে বের করে পেছন ফিরে চেয়ে দেখো।'

'কি দেখব?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল মিরহাম, লক্ষ করল কুতজার এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, যেন প্রয়োজন দেখা দিলেই দৌড়োতে পারে জঙ্গলের দিকে।

'জানি না।'

পাংশু হয়ে গেল মিরহামের মুখের চেহারা। খালি হাত বের করে নিল স্কার্ফের পকেট থেকে। মিরহামের ঠিক পেছনে, কুঠার মাথার ওপর তুলে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে সিকুবা আ, ঘোড়া মুখো দৈত্য।

যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সময়।

'চাইব?'

'চাও। আস্তে আস্তে।'

অতি সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে চাইল মিরহাম। সিকুবা আ-র হাতের কুঠার, কুঠারের ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা দেখল ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড ধরে। তারপর, আরও সতর্কতার সঙ্গে মাথা সোজা করে তাকাল চম্রা মং-এর দিকে। 'সিকুবা আ তাহলে পবিত্র মন্দিরে যাবে?'

'যাবে।'

'যাবেই তো!' মিরহাম বলল, 'তবে, বাতাস যদি অন্য দিকে বইত, অন্যরকম ঘটনা ঘটত।'

'যাবে কিনা?' চম্রা মং শান্তভাবে জানতে চাইল।

'যাবে না কেন?' মিরহাম অপ্রতিভ হাসল, 'যাবেই তো!'

'হ্যাঁ।' জোর গলায় বলল চম্রা মং। 'যাবে।'

ছয়

জামান ও তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে একধারে সরে এসেছে রানা। আবার একবার বুঝিয়ে দিল সে পরিস্থিতিটা। লাল পাহাড়ের কথা শুনে সঙ্গী দু'জন উৎসাহী হয়ে উঠল, কিন্তু জামানকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'না গেলে হয় না, রানা?'

'যতক্ষণ না শিরিনের একটা ব্যবস্থা করা যাচ্ছে, ততক্ষণ এগোতেই হবে। একা হলে তো কাল রাতেই সটকে পড়তাম। তোমার সাহায্যের দরকার পড়ত না।'

'কিন্তু এই অবস্থায় কি সাহায্য করব আমি? কাউকে কোন ইনফর্মেশন দিয়ে আসতে পারিনি। একটু যদি বিপদের সঙ্কেত পেতাম আগে, তাহলে…'

'উপায় ছিল না।' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'আসফ খানকে আশা করেছিলাম। এল না?'

'বাড়িঘর জ্বলে গেছে দেখে কাল বিকেলেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওকে কক্সবাজার। যোগাযোগ করতে পারিনি। এদেরকে হাতের কাছে পেলাম, নিয়ে এসেছি সঙ্গে।' বলেই চট্ করে ইংরেজি ভাষায় যোগ করল জামান, 'এদের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য আশা করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটার গুরুত্ব জানা থাকলে এদেরকে আনতাম না।'

আগুনের কাছ থেকে চিৎকার করে উঠল মিরহাম, 'কই, আর কত দেরি, রানা? এসো, মুখোমুখি বসি, আলোচনা হোক।'

'শিরিনের জন্যে কি ব্যবস্থার কথা ভাবছ?', নিচু গলায় জানতে চাইল জামান। 'সরাসরি আক্রমণ করে বসলে কেমন হয়?'

'ভাল হয় না। ওরা সেটাই আশা করছে! প্রস্তুতও আছে। এদের তালে তাল মিলিয়ে চলতে হবে আমাদের আরও কিছুটা সময়! সেই সঙ্গে চলতে থাকবে প্ল্যান প্রোগ্রাম। আমাদের খুব বেশি আলাপের সুযোগ রাখবে না মিরহাম। কি করতে হবে, অল্পকথায় জানিয়ে দেব আমি তোমাকে আজ রাতেই।'

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়াল রানা। আর সবাইকে আগুনের ধারে গিয়ে বসবার ইঙ্গিত করে চলে এল শিরিনের সামনে। বসে ছিল, উঠে পড়ল শিরিন। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল একপাশে। 'রানা! ওই মেয়েটা সারাক্ষণ…'

'চুপ।' ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে উচা হ্লা। বলল, 'আমি জানি। মিরহামের বোন হয়। একে ঘাঁটিয়ো না।'

মিরহামের ভাষায়, বিপদের বড় বিপদ হলো, পুলিস। জঙ্গলের মধ্যে এই ফাঁকা জায়গাটুকুর অস্তিত্ব একবার জেনে ফেললে এটা তখন আর গোপন আশ্রয় থাকবে না, এটা হবে মরণ ফাঁদ।

চম্রা মং অস্বীকার করলেও মিরহামের ধারণা কোন না কোন কৌশলে মাইজ চাপাহের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ওয়াকলাই। জামান, আসমান খান আর মোবারক হোসেনকেও দেখেছে মাইজ চাপাহ। গুলির শব্দ তো শুনেইছে।

মাইজ চাপাহ সম্পর্কে জানা গেল, ওর বাবা ছিল কুখ্যাত ডাকাত। ডাকাতের ছেলে পুলিস হয়েছে। ফলটা যা হয় তাই—দুটো গুণই রয়েছে তার মধ্যে ভয়ঙ্কর ভাবে। পারে না এমন কাজ নেই।

রানা বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই আশা করছ না, পুলিসের সঙ্গে গোলাগুলি করতে রাজি হব আমরা?'

'না।' মিরহাম বলল, 'পাহাড়ে চড়ে যাওয়া যেতে পারে, পুলিসদের চোখে ধরা নাও পড়তে পারি। ঘোড়াগুলোকে তাহলে রেখে যেতে হবে। কিন্তু ঘোড়া ছাড়া আবার এই দুর্গম অভিযান সম্ভব নয়। সমস্যাটা এইখানেই।'

'কি করতে চাও তুমি?'

'লোক কমাতে হবে।'

তারু তাকুন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'অর্থাৎ?' ঘা চাটতে ভুলে গেল সে হঠাৎ।

'এত লোক নিয়ে পুলিসের চোখে ফাঁকি দেয়া যাবে না।'

'তুমি বলতে চাইছ আরও কাউকে খুন করবে?' পায়চারি থামিয়ে প্রশ্ন করল চম্মা মং।

'ছিঃ, ছিঃ!' মাথা দোলাল মিরহাম, 'খুন শব্দটা আমি উচ্চারণ করেছি একবারও, চম্মা মং?'

'শব্দের কথা থাক। চিন্তার কথা বলো।'

'নাহ্!' মিরহাম বলল, 'তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি। আমরা একমত হয়ে যা ঠিক করার করব।'

'তা কিভাবে সম্ভব?'

'সহজেই সম্ভব।' মিরহাম বলল, 'সিদ্ধান্ত নেব আমি, তোমরা মেনে নেবে।'

'তুমি কে?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আসগান খান। দাঁতে দাঁত চেপে জানতে চাইল, 'তুমি কে সিদ্ধান্ত নেবার?'

মিরহাম হাসল। বলল, 'চেঁচিয়ো না, গলার রগ ছিঁড়ে যেতে পারে। আমি মিরহাম। দলের নেতা। আমি তোমাদের কথা বলছি না। আমাদের দলের লোক কমাবার কথা বলছি। তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ঝগড়া বাধিয়ো না।'

উঠে দাঁড়াল তারু তাকুন। দেখাদেখি সিকুবা আ-ও। চম্মা মং গ্রীবা উঁচু করে তাকিয়ে আছে। কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে নাক চুলকোচ্ছে কুতজার।

'কাকে, মিরহাম?'

মিরহাম তারু তাকুনের দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল, 'ছিঃ, ছিঃ, তারু তাকুন! তোমাকে ত্যাগ করব আমি, একথা ভাবলে কিভাবে?'

মুখটা বাঁকাচোরা হয়ে গেল তারু তাকুনের! মনে হলো, হয় সে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে, নয়তো হেসে উঠবে।

'তোমাকে চিনি, মিরহাম। কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আমাকেই বেছে নিয়েছ।'

'ঠিক ধরেছ।' মিরহাম বলল, 'বেছে নিয়েছি তোমাকেই। তবে, আমাদের সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হবে অল্প কালের জন্যে। তোমাদের নেতা আমি, না? নেতার হুকুম মানতে হয়, না?'

'আমাকে নিয়ে কি করবে তুমি?'

দুই হাত উঁচু করে সবাইকে কাছে ডাকল মিরহাম, 'এসো। মন দিয়ে শোনো। পবিত্র মন্দিরের রুবি চাই আমরা। এক করা টাকার চুনি পাথর। পেতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।'

'তার মানে, মিরহাম, আবার খুন করবে তুমি? জিজ্ঞেস করল জামান।

'জামান সাহেব, লেখাপড়া জানা লোক তুমি, ভাবনাচিন্তা অগ্রিম করতে শেখোনি?' রানার দিকে তাকাল এবার, 'রানা, আমিই নেতা, মানো? লাল পাহাড়ে চলেছি আমরা। নেতা আমিই মানো?'

'রুবির লোভ আমার নেই।' রানা বলল, 'কে নেতা তাও জানার দরকার নেই আমার। তবে, যাচ্ছি আমি।'

চিন্তিত দেখাল মিরহামকে, বলল, 'জেদি লোক।' ঝেড়ে ফেলল চিন্তাভাবনা মাথা ঝাঁকিয়ে, বলল, 'মন্দ।'

'নাটক বাদ দাও।' হঠাৎ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল রগচটা আসমান খান। 'কে যাবে না যাবে সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না। থাম্পা মন্দিরে আমরা সবাই যাব। অন্য কিছু যদি বলার থাকে তোমার, বলো।'

'মোরগের মত গলা তোমার।' বলল মিরহাম।

জামান ও রানার বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ল।

নাক চুলকোচ্ছিল কৃতজার, স্থির হয়ে গেল হাতটা। পিছিয়ে গিয়ে মাথা দোলাল সে সবজান্তার মত, আফসোসের ভঙ্গিতে। যেন আসমান খানের জন্যে দুঃখ হচ্ছে তার।

মুরং ভাষায় ওয়াকলাই মানে মোরগ!

একটু বিরতি দিয়ে আবার বলল মিরহাম, 'মোরগের ডাক আমি পছন্দ করি না!'

রানা বুঝল, বিপদ সঙ্কেত দিচ্ছে মিরহাম। মোরগের ডাক মানে বিপদ সঙ্কেত। বলল, 'আসমান খান, তুমি কথা বোলো না।'

'থাম্পা মন্দিরের রুবি কি এর বাপের সম্পত্তি?' আসমান খান রাগে কাঁপছে, 'ও কে?'

'আমি কে? সত্যি, আমি কে?' আকাশের এদিক ওদিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে অস্থিরভাবে তাকাতে লাগল মিরহাম, 'কে আমাকে বলে দেবে, আমি কে!'

'আসমান খান!' ফিসফিস করে বলল জামান, 'মরবে নাকি? চুপ করে যাও!'

'এমন জানলে আমি আসতাম না, জামান সাহেব।' তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল আসমান খান। 'এ কোথায় নিয়ে এসেছেন আপনি আমাদের? এই লোকটার ভাবসাব পছন্দ হচ্ছে না আমার। ওর রকম দেখে মনে হচ্ছে যেন ও এই জঙ্গলের সম্রাট, আমরা ওর বন্দী! কেন? দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেছে? ও যা বলবে বাপ বাপ বলে তাই করতে হবে?'

'মগেরই মুল্লুক এটা।' শান্ত গলায় বলল মিরহাম।

মিরহামের ডান পাশে, একটু পেছনে দাঁড়িয়ে আছে চমা মং। আসমান খানের উদ্দেশে ঠোঁট জোড়ায় একটা আঙুল রেখে চুপ করে যেতে ইঙ্গিত দিচ্ছে সে। কিন্তু তার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না আসমান খান।

'না। আমি মানি না।' চেঁচিয়ে উঠল আসমান খান বোকার মত। সবাই বুঝল অবস্থা এখন আয়ত্তের বাইরে।

'আসমান!' চাপা স্বরে সতর্ক করল জামান।

'আমি যাব না আপনাদের সঙ্গে।' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আসমান খান।

বিস্ফারিত হয়ে গেছে কুতজারের চোখ দুটো আতঙ্কে।

'তোমাকে নিয়েও যাব না।' বলেই গুলি করল মিরহাম।

টেরও পেল না আসমান খান, কখন মারা গেছে। কপাল ফুটো হয়ে মগজে গিয়ে ঢুকেছে গুলি। বার কয়েক গলাকাটা হাঁসের মত লাফাল শরীরটা, তারপর স্থির হয়ে গেল মাটির ওপর।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জামান। হাতে রাইফেল।

'মিরহাম, আর নয়। সময় হয়ে গেছে।'

ঝট করে জামানের মুখের দিকে চাইল রানা। দেখল, মুহূর্তে টকটকে লাল হয়ে গেছে ওর চোখ জোড়া। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সে রাগে—হারিয়ে ফেলেছে কাণ্ডজ্ঞান।

মিরহামের রিভলভার ধরা হাতটা তার শরীরের পাশে ঝুলছে। জামানের রাইফেল ধরা হাতটাও তার শরীরের পাশে ঝুলছে, কিন্তু নলের মুখটা চেয়ে রয়েছে সোজা মিরহামের বুকের দিকে। তর্জনী ট্রিগারে। আপাদমস্তক বার কয়েক জামানকে দেখল মিরহাম। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে। সময় হয়ে গেছে।'

বাঁ পা থেকে ডান পায়ে দেহের ভর রাখল জামান, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। 'ফিরে যাচ্ছি আমরা। তোমাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। একে একে খুন হয়ে যাব আমরা সবাই তোমার হাতে।'

দুঃখিত, আহত দেখাচ্ছে মিরহামকে।

'কিন্তু অন্যায় কি করেছি আমি, জামান সাহেব? নেতা আমি, আমার কথা না শুনতে হবে সবাইকে?'

'জানি না। কিন্তু চললাম।' বলছে বটে, পা বাড়াচ্ছে না জামান।

চোখ মুখ বিকৃত করে চিন্তা করছে মিরহাম। ট্রিগারের উপর জামান ছোট্ট একটা চাপ দিলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে ওর। রানার কাছে অস্ত্র নেই। ওর ওয়ালথারটা কেড়ে নিয়েছে সে, রাইফেলটাও। মোবারকের পায়ের কাছে রয়েছে একটা রাইফেল। মিরহাম জানে, তার পেছনে চয়া মং আর সিকুবা আ তৈরি হয়ে আছে কুঠার আর ছোরা নিয়ে! কাকে আঘাত করবে ওরা মিরহাম জানে না। চয়া মং অবশ্য একসময় কথা দিয়েছিল, তার নেতৃত্ব মানবে যতক্ষণ সে ওদের স্বার্থের বিরুদ্ধে না যাবে। নির্ভেজাল মার্মা ওরা দু'জন, কথা দিয়ে কথা রাখে। কিন্তু ইতোমধ্যেই দু'বার অমান্য করেছে ওরা ওকে। জোর দিয়ে বলা যায় না কিছুই। চয়া মং বিশেষ ভক্তি করতে শুরু করেছে রানাকে, লক্ষ্য করেছে মিরহাম।

'ঠিক আছে।' মিরহাম বলল, 'যাও। নিজের ইচ্ছায় এসেছিলে, নিজের ইচ্ছাতেই যাও। কিন্তু শুধু তোমরা দু'জন।'

'রানা আর শিরিনও যাবে আমার সঙ্গে।'

'সেই অনুমতি আমি তোমাকে দিতে পারি না, জামান সাহেব।' নরম গলায় বলল মিরহাম। 'দলের কেউ মত দেবে না, জিজ্ঞেস করে দেখতে

পারো। কিন্তু আমি বলি খামোকা গরম করছ মাথাটা। আসমান খান কেউ নয় তোমার। তার জন্যে কেন বিবাদ করবে আমাদের সঙ্গে? কে বাঁচবে কে মরবে ঠিক আছে?'

'কোন কারণ ছাড়া ওকে খুন করেছ তুমি, মিরহাম।'

'আলোচনা করে মীমাংসা হয় না?'

'না।'

'তাহলে ভাবছ, যেতে দেব?'

'না দেবার ক্ষমতা আছে তোমার? কি দিয়ে ঠেকাবে? একচুল নড়লেই গুলি করব।'

চারদিকে তাকাল মিরহাম। বলল, 'মা, উচা হ্লা, দেখাও তোমরা। খবরদার, মোবারক, হাত বাড়িয়ো না।'

চট্ করে হাত সরিয়ে নিল মোবারক রাইফেলের বাঁট থেকে।

অদূরে বসে আছে মো আ আর উচা হ্লা। গায়ে চাদর জড়ানো। কাঁধ ঝাঁকি দিতেই খসে পড়ল গায়ের চাদর। দেখা গেল দু'জনের হাতে দুটো অটোমেটিক কারবাইন। সোজা জামানের দিকে তাক করে ধরা।

'আর কারও সম্পর্কে আমি জানি না কিছু,' বলল মিরহাম নরম গলায়। 'কিন্তু উচা হ্লা আর মো আ সম্পর্কে জানি। একজন আমার বোন। অপরজন মা। ওরা আমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র যেমন হাসছে, বিশ্বাস করো, অমনি হাসতে হাসতে খুন করে ফেলবে তোমাদের সবাইকে।'

চুপসে গেছে জামানের মুখ। বলল, 'বিশ্বাস করি।'

'তাহলে, বিশ্বাস করো, সত্যি একটা চমৎকার পরিকল্পনা করেছি আমি। দলটাকে দু'ভাগ করে আমরা সহজেই পুলিসদের চোখে ধুলো দিতে পারব। কৌশলটা কাজে লাগলে, রক্তপাত হবে না।'

'আসমানকে আমাদের চোখের সামনে খুন করেছ। এরপর আমাদের সহযোগিতা কিভাবে আশা করো তুমি, মিরহাম?'

'আশা আমি কিছুই করি না, জামান সাহেব। যা প্রয়োজন, আদায় করে নিই। গোলমাল না করলে কারও ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আমার সর্দারি যে না মানবে, বলুক মুখে, হয়ে যাক ফয়সালা। কথা না শুনলে যদি আমার দলের লোককে খুন করতে পারি, তোমার দলের লোককে পারব না কেন? আমিই তো নেতা। মেনেছে রানা। তুমি না মানো? আলোচনা করে দেখো রানার সঙ্গে। পরামর্শ করতে পারো। কিন্তু ভুলে যেয়ো না, দুটো কারবাইন ধরা রইল তোমাদের দিকে।'

'আমার রাইফেলটার কথাও ভুলতে নিষেধ করে দাও ওদেরকে।' জামান বলল। 'আমি যদি মরি, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে মরব।'

রাইফেলের মুখ মিরহামের দিকে ধরে রেখেই সাবধানে সরে গেল জামান কয়েক হাত তফাতে। সরে এল রানাও। রানার শরীরটা জামানকে আড়াল করে। সঙ্গে সঙ্গে সাঁই করে উচা হ্লার হাতের কারবাইনটা ঘুরে গেল শিরিনের দিকে। কাউকে কিছু বলতে হলো না। একটু এদিক ওদিক হলে কি

ঘটবে বুঝে নিল সবাই।

'এবার? রানা?'

'উপায় নেই। ভাল সময়ই বেছেছিলে, কিন্তু উল্টে গেছে ছক। ফণা নামিয়ে নেয়া ছাড়া রাস্তা নেই এখন।'

'পরে আর কোন সুযোগ কিন্তু নাও পেতে পারি।'

'তাহলেও অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। শিরিন না থাকলে তুমি-আমি ঝুঁকি নিতে পারতাম হয়তো—এখন কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না।'

'একটার পর একটা খুন করছে কুত্তাটা।'

'আসমান লোকটা এত বড় গাধা, ভাবিনি। নিজের দোষেই মারা পড়েছে সে।'

'মিরহামকে বলি তাহলে, যাব আমরা?' জামান প্রশ্ন করল।

'আমি বলব।' বলল রানা।

'তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো!' মিরহাম উদ্বিগ্ন। 'বাপের শালা চাঁদমামা লাফ দিয়ে আকাশে উঠছে। তারু তাকুন অনেক দূর চলে গেছে এরি মধ্যে। এখুনি রওনা হওয়া দরকার আমাদের। কোন সমস্যা, রানা? তৈরি হয়েছি আমরা?'

'হয়েছি।' রানা বলল, 'জামান, সব ঠিক?'

ওরা তিনজন শেষবারের মত তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল ভারবাহী ঘোড়াগুলোকে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসা নারী-পুরুষকে।

'সব ঠিক।' জামান ঘোড়ায় চড়তে চড়তে বলল।

তারু তাকুনের অধীনে একটা দল আগেই রওনা হয়ে গেছে। দলে আছে আপ্রোমা ও মোবারক। পুলিস এই তিনজনের একজনকেও চেনে না, তাই ওদেরকেই পাঠানো হয়েছে। সরাসরি ক্যাম্পে যাবে ওরা, পেছন দিক থেকে। পুরুষরা চিৎকার জুড়বে, মেয়েটা মাটিতে পড়ে হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে কান্নাকাটি করবে। হেড কনস্টেবল মাইক্ল চাপাহকে তারা বলবে মিরহাম মার্মার খপ্পর থেকে বহুকষ্টে নিজেদেরকে মুক্ত করে পালিয়ে এসেছে। পুলিস ক্যাম্পের পেছনের জঙ্গল থেকে শোরগোল তুলবে ওরা। ফলে ক্যাম্প ছেড়ে পুলিসের দল জঙ্গলে প্রবেশ করবে। সেই সুযোগে মিরহামের দলটা পাহাড় থেকে নামবে নিচে, গিরিপথে প্রবেশ করবে। গিরিপথের ভিতর একবার প্রবেশ করতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই। ঠিক হয়েছে, গভীর রাতে তারু তাকুন আর মোবারক পুলিস ক্যাম্প থেকে পালাবে মূল দলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে।

মিরহামের পরিকল্পনাটা ভালই, রানার ধারণা, কিন্তু পরিকল্পনার দুর্বল দিক হলো আপ্রোমা। তার দেহটাকে কেনা হয়েছিল চ্যাং ভাগলের জন্যে। কেউ তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। ক্যাম্পে গিয়ে পুলিসদেরকে সে সত্যি কথাগুলো গড়গড় করে বলে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে, বারোটা বাজবে তারু তাকুন আর মোবারকের। তবে, মিরহাম আপ্রোমার কাছ থেকে কথা আদায়

করে নিয়েছে। অভিনয়টা করার জন্যে আপ্রোমা এক প্রস্থ এনিজ্যি (মেয়েদের পরনের কাপড়) দাবি করে। মিরহাম রাজি হয় দিতে।

যাত্রা শুরু হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অসমতল এলাকার প্রান্তে এসে দাঁড়াল ঘোড়াগুলো। ক্রমশ উঠে গেছে পাহাড় শ্রেণী। দুর্ধর্ষ পাহাড়ী মানুষদের চলাফেরায় সরু পথের সৃষ্টি হয়েছে। মাটির ঢিবি, বিচ্ছিন্ন গাছপালা, পাথরের ছোটবড় টুকরো, এসব আড়াল করে রেখেছে উপত্যকার সমতল অঞ্চলটাকে। গিরিপথের মুখটা সেইদিকে। মুখের কাছে নয়, চম্না মং-এর বক্তব্য অনুযায়ী পুলিসদের ক্যাম্পটা সাত আটশো গজ দূরে। একটা ছোট হ্রদের পাশে ক্যাম্প, গিরিপথের কাছ থেকে দেখা যায় না। কিন্তু ক্যাম্পের লোকেরা আড়াল থেকে ঠিকই দেখতে পায় প্রবেশ পথটা।

'দাঁড়াও, আবার আমি তোমার শিরিনের বাঁধন পরীক্ষা করব।' রানার উদ্দেশে বলল মিরহাম। ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল সে সকলের পেছন থেকে।

শিরিনের মুখ বেঁধে দেয়া হয়েছে রুমাল দিয়ে।

'একটু আওয়াজ না হয়!' মিরহাম বলল, 'গুলি না করে উপায় থাকবে না আমার।'

'ঠিক বলছ।' রানা বলল, 'তুমি গুলি করবে। তারপর, কিংবা একই সঙ্গে, আমিও গুলি করব।'

'তুমি? গুলি করবে?' মিরহাম সকৌতুকে বলল, 'কি দিয়ে।'

'তোমার বা জামানের বা মো আর, কারও কাছ থেকে কেড়ে নেব অস্ত্র।' রানা বলল।

'তা তুমি পারো।' স্বীকার করল মিরহাম। 'জানি। সেইজন্যেই তো তোমার দোস্তি চাই আমি।' মিরহাম আদর করে রানার পিঠে চাপড় মারল। 'স্বীকার করি পুরুষ তুমি। জানো, রানা, তোমাকে আমি সঙ্গে পেলে…কি যেন বলে কি যেন বলে…' শব্দটার সন্ধানে চোখ বুজে ভাবতে লাগল মিরহাম, 'সম্রাট, সত্যিই সম্রাট বনে যেতাম এই জঙ্গলের! তুমি আমার মন্ত্রী হতে?'

'না।'

লোকটা ম্যানিয়াক, ভাবল রানা। না বলতে যা দেরি, উবে গেল মিরহামের মুখের হাসি। কোমরের পকেটে চলে গেল হাতটা।

'না?'

'না। মন্ত্রী নয়, সেনাপতি হতাম।'

'সেনাপতি—কারণ?'

'সৈন্য-সামন্ত সব আমার অধীনে থাকত।'

মিরহামকে দ্বিধান্বিত, সন্দিহান মনে হলো, 'ঠাট্টা করছ?'

'না। ঠাট্টা কিসের?'

'তুমি সেনাপতি হলে তোমাকে কি আমার ভয় করতে হত?

'হত।'

নিঃশব্দে শরীর কাঁপিয়ে হাসল কিছুক্ষণ মিরহাম। হাসি থামতে বলল, 'ভয়? নাহ্, তুমি রানা, মিরহামকে চিনতে পারোনি। মিরহাম জন্মেছেই ভয়-

ডর ছাড়া। একটা কথা বলি?'

'বলো।'

'আমার মৃত্যু কিভাবে হবে জানো?'

রানা চুপ করে রইল।

'আমাকে খুন করে, এমন কেউ ত্রিভুবনে জন্মগ্রহণ করেনি। তাহলে, সমস্যা নয়? কেউ যদি আমাকে খুন করতে না পারে, মরি কিভাবে? অথচ জানি, এমনি এমনি মরব না আমি। খুন হব, তবে মরব। এই ধাঁধার মীমাংসা করতে পারো?'

'পারি,' রানা বলল, 'তুমি আত্মহত্যা করবে।'

'ঠিকই বলেছ!' খুশি হলো যেন মিরহাম সমাধান পেয়ে। 'ঠিকই বলেছ তুমি। উপায় নেই, তাই করতে হবে।' অসহায় ভাবে হাত নাড়ল মিরহাম। 'তুমি বুদ্ধি রাখো এইখানে।' নিজের মাথায় অঙুল রেখে দেখাল।

পাহাড়ী পথ ধরে এগোল ওরা। মিরহামকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। জামান গম্ভীর। শিরিন ঘন ঘন তাকাচ্ছে রানার দিকে। উচা হ্লা দৃষ্টি ফেরাচ্ছে না মুহূর্তের জন্যেও শিরিনের ওপর থেকে।

ব্যাপারটা এখন শুধু অস্বস্তিকর নয়, রীতিমত বিপজ্জনকও ঠেকছে রানার কাছে।

যতই ওপরে উঠছে ওরা, ছবির মত নিচের দৃশ্যগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। চাঁদের হাসিতে উদ্ভাসিত উপত্যকা।

রওয়ানা হবার দু'ঘণ্টা পর তারু তাকুন পুলিস ক্যাম্পের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাবে, কথা আছে।

ওই সময়ের মধ্যেই পাহাড়ের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছুল মিরহামের দলটা। পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় সাবধান করে দিল সে: 'তারু তাকুনের চিৎকার আমরা শুনতে পাব। ক্যাম্পের লোকেরা ওদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেই আমরা শুরু করব নামতে। তখন যদি শিরিন বা আর কেউ চিৎকার করে ক্যাম্পের লোকদের নজর এদিক ফেরাতে চাও—কি হবে?'

'মেরে ফেলবে তুমি।' জামান বলল, 'সবাই জানি আমরা।'

'জানা থাকলেই ভাল।' মিরহাম বলল। ঘোড়া থেকে নেমে দশ কদম এগিয়ে উঁকি দিল সে। পেছন দিকে হাত নাড়ল, ডাকছে।

রানাও নামল ঘোড়া থেকে। মিরহামের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই চাপা গর্জন, 'তুমি কেন? আমি চয়া মংকে ডেকেছি।'

'তুমি ডেকেছ বলে না, আমি নিজেই এসেছি।'

রানার দিকে চেয়ে রইল মিরহাম।

'দেখছ কি?' ভুরু নাচাল রানা।

'সাহস আছে, স্বীকার করি।' গম্ভীর মুখে বলল মিরহাম। 'কিন্তু'

কৃতজ্ঞার ও চয়া মং, রানা আর মিরহামের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, 'মিরহাম, কি হলো? কি বলছ একে?'

'চুপ!' ধমক দিল মিরহাম. 'কথা নয়, কাজ করো। দেখো ক্যাম্পের পেছন

দিকটা দেখা যায় কিনা।' রানার বুকে টোকা মারল, 'আমরা একজন আর একজনের দোস্তো, আমরা কি বলি না বলি কেউ মাথা ঘামাবে না।'

চম্মা মং বলল, 'ক্যাম্পের কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।'

সে থামতেই, ভেসে এল নারী কণ্ঠের দুর্বোধ্য চিৎকার।

'আপ্রোমা!' মিরহাম বলল।

ক্যাম্পে এত পুলিস ছিল, কল্পনাও করেনি ওরা। একসঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেলগুলো। ফাঁকা আওয়াজ করছে অবিরাম, কান পাতা দায় হয়ে উঠল।

ছুটল মিরহাম। তার সঙ্গে রানা, চম্মা মং, কুতজার। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ল ওরা।

ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে ঘোড়াগুলো পড়িমরি করে নামছে।

পাঁচশো গজ দূরের পুলিস ক্যাম্প থেকে উপর্যুপরি গুলির শব্দ, আপ্রোমার দুর্বোধ্য গলা ফাটানো চিৎকার, সময় নেই লক্ষ্য করে শোনার। ঘোড়সওয়ারদের ইচ্ছের বশে নেই আর, বেসামাল হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো। নামা যখন একবার শুরু হয়েছে, সেই উপত্যকায় না পৌঁছে থামতে পারবে না।

এরকম কিছুর জন্যে তৈরি ছিল না মিরহাম। শত চেষ্টা সত্ত্বেও পিছিয়ে থাকল না তার ঘোড়া। সবার আগে ছুটছে জানোয়ারটা।

পেছনে রাইফেলের গুঁতো খেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। উত্তেজনায় অস্থির দেখাচ্ছে জামানকে। সবেগে নামছে, রাইফেলটা বাড়িয়ে ধরেছে রানার দিকে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার।

না। ভাবল রানা। পরক্ষণে ইচ্ছা হলো খুনিটাকে শেষ করে দেবার। তারপর ভাবল, অন্তত বন্দী করে ফেলা যায়।

কিন্তু রাইফেলটা নিল না রানা। মিরহাম এবং তার দলটাকে পরাস্ত করার এমন সুবর্ণ সুযোগটা কেন যে ও হাত ছাড়া করল নিজেও জানে না।

কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই উপত্যকায় নামল ওরা। গিরিপথের ভিতর অন্ধকার, প্রবেশ করতেই মিরহাম বলল, 'এই সুড়ঙ্গের ভিতর জামান সাহেবের উচিত না হবে রানাকে রাইফেল দেয়া। অন্ধকারে কার না কার গায়ে গুলি লাগবে।'

রানা চমকাল। আশ্চর্য, দৃষ্টি এড়ায়নি ব্যাপারটা মিরহামের। বুদ্ধিটা তারু তাকুনের। মোবারকের মৌন সমর্থন ছিল। ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে ফেলেছিল ওরা।

আসল কথা থাম্পা মন্দির। ক্যাম্পে ঢুকলে, বেরুনো কি সহজ? সুতরাং পুলিস ক্যাম্পে যাওয়া চলবে না। আপ্রোমা মেয়েটাকে তারু তাকুন আড়াই টাকা দামের একটা গোলাকার, পিছনে ব্রিজিদ বার্দোতের ছবিওয়ালা আয়না ঘুষ দিল। রাজি হলো ওদের প্রস্তাবে আপ্রোমা।

প্রথমে কাঁদতে শুরু করে আপ্রোমা। কিন্তু কাজ হয় না তাতে কোন। ক্যাম্পের পুলিসদের ঘুমই ভাঙে না। পরে আপ্রোমাকে চিৎকার করে মার্মা ভাষায় 'বাঁচাও বাঁচাও' রব তুলতে বলে তারু তাকুন। কাজ হয়, রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে শুরু করে পুলিসের দল। খানিক পর ওরা বুঝতে পারে, সাবধানতার জন্যে ক্যাম্প থেকে ফাঁকা গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। জঙ্গল থেকে বের

করে দিয়ে তারু তাকুন আপ্রোমাকে ক্যাম্পের দিকে দৌড়ুতে বাধ্য করে। মোবারককে সঙ্গে নিয়ে সে এরপর জঙ্গল ঘুরে, গিরিপথের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেল ওরা গিরিপথে ঢুকবার মুখেই।

গিরিপথ থেকে বেরিয়ে চাঁদের আলোয় উপত্যকার ওপর দিয়ে রহস্যময় অঞ্চলটার গন্ধ নাকে নিতে নিতে এগোল দলটা। শব্দহীন নির্জনতা সম্মোহিত করল রানাকে। মো আ-র অসীম দয়া, সবাইকে এক মগ করে মদ দিল সে। এমনই কড়া, হ্যাজাক বাতি পর্যন্ত জ্বালানো যায় এই পানীয় দিয়ে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে খেল রানা। সকলের অগোচরে ফেলে দিল অর্ধেকটা।

মো আ সর্বক্ষণ শিরিনের কাছাকাছি আছে। জোর করে খাইয়েছে শিরিনকে দু'ঢোক মদ। পরিবেশটা এমনই সুন্দর, বুড়ি হাত দুলিয়ে মাথা নেড়ে কর্কশ গলায় গান জুড়ে দিতেও মিরহাম তেড়ে মারতে এল না।

উচা হলার দিকে তাকাতে আবার সেই অস্বস্তি অনুভব করল রানা। সর্বক্ষণ হয় রানার দিকে, নয় শিরিনের দিকে নজর তার, পলকহীন।

উচা হলা শিরিনকে একা যেন না পায়! সাবধান করে দিল নিজেকে রানা। প্রথম সুযোগেই শিরিনকে খুন করবে ও।

মধ্যরাত্রির পর উচা হলা পিছিয়ে গেল, চমা মং আর সিকুবা আ-র পাশে। বুড়ি মো আ নিজের গল্প শোনাচ্ছে শিরিনকে। মিরহামের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে অনেক আগেই শিরিনের মুখ আর হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে সে।

পানির অভাব বোধ করছিল ওরা। মাতামুহুরী পেরোবার পর থেকে পানির উৎস চোখে পড়েনি আর। প্রশ্ন করতে মিরহাম বলল, 'খুব বেশি দূরে নয় আর। বাতাস তাজা হচ্ছে, গন্ধ পাচ্ছ?'

ভোর হতে দেরি নেই আর। আকাশ যদিও এখনও অন্ধকার, তবু ঠাণ্ডা বাতাসই নিকটবর্তী ভোরের পূর্বাভাস দিচ্ছে।

'আমাদের মদকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারো, রানা?'

জানতে চাইল মিরহাম। না, পারে না রানা। রাত্রি জাগরণের পরও এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করছে না ও।

'বুঝলে রানা, স্বীকার না করে উপায় নেই, আমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ। মাইজ চাপাহকে কেমন বুদ্ধু বানালাম দেখলে?'

কথা বলতে ভাল লাগছে না রানার। চুপ করে রইল।

'মাইজ চাপাহ, বুঝলে, বাপের বেটা হতে পারল না। ওর বাপের শিষ্য ছিলাম আমি। হাতেখড়ি হয়েছিল আমার তারই কাছে, তা জানো?'

মাথা নাড়ল রানা।

বলে চলেছে মিরহাম যা ইচ্ছা তাই। শুনছে না রানা।

'কি জানো, রানা, আমার সবচেয়ে ভাল গুণ হলো, কিছুই, কেউই আমাকে ধরে রাখতে পারে না। হাজার হাজার মেয়েকে ভালবেসে দেখেছি। কি আছে, বলো, কি দেয় তারা, বলো?'

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরল রানার, 'কি বললে যেন?'

'বললাম, ভালবাসতে পারলাম না। মাঝে মাঝে মন্দ লাগে। না কিছুকে, না কাউকে—মনে ধরে না।' মিরহাম বলল, 'ভাল লাগে, রাগ কোরো না—লোউ। লোউ, টাকা, আর মদ।'

'রক্ত দেখতে ভাল লাগে তোমার?'

'বড়।'

'কাউকে কোনদিন ভালবাসনি? কারও দুঃখ, কিংবা অন্য কোন কারণে কারও জন্যে চোখে পানি আসেনি তোমার? মন খারাপ হয়ে যায়নি? কিংবা ভালমানুষ হবার তাগিদ অনুভব করোনি?'

'ভাল কি করে হব, দোস্তো? একশোজন ডাকু সর্দার, পঁচাশি জন বন্ধু, শ'খানেক বোকা মানুষ, এক কুড়ি পুলিস আর এগারো জন ভাইকে খুন করার পর...'

চমকে উঠল রানা। বুকের রক্ত ছলকে উঠল ওর। নির্জন পার্বত্য এলাকায় মিরহামের অট্টহাসি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে চারদিক থেকে। রানার মনে হলো, পৃথিবীর সব খুনিরা একত্রিত হয়ে হাসছে।

'থামো!' স্থানকালপাত্র ভুলে গর্জে উঠল রানা।

চমকে উঠে ঘোড়া দাঁড় করাল মিরহাম। ধীরে ধীরে ঠোঁট ফাঁক হলো তার, সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। নিঃশব্দে হাসছে।

'ভয় লাগে?' বলল, 'আমি জানি ভয় পেয়েছ তুমি। মিরহাম মার্মা,' নিজের বুকে আঙুল ঠুকল, 'সবাই ভয় পায়। ভাল লাগে, কেউ ভয় পেলে ভাল লাগে। এইটাই।'

সব ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে মিরহাম নিজের ঘোড়ার পাঁজরে খোঁচা মারল পা দিয়ে।

খানিক পর মিরহাম বলল, 'তুমি জানো, আমার বোন তোমার মেয়েমানুষকে খুন করতে চাইছে?'

ঝট্ করে তাকাল রানা। কিন্তু কোন কথা বলল না।

রানার জবাব না পেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ ঘোড়া চালাল মিরহাম। বার কয়েক চাইল রানার মুখের দিকে। সর্বক্ষণ রানাকে সঙ্গে রেখেছে সে। সবার পেছনে ওরা।

'তোমার ওই শিরিনকে বুঝলে, খুব ভাল লাগে আমার। তোমাকে আমার দরকার, না? তোমার দরকার ওই শিরিনকে, না? তাই, ওর কোন ক্ষতি আমি হতে দেব না। তবে, দোস্তো, ওর কাছ থেকে উচা হ্লাকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। সে একমাত্র তুমিই পারো।'

'আমি পারি? কিভাবে?'

সমস্ত মুখটা থমথমে হয়ে উঠল মিরহামের, 'দেখো, রানা, আমি ঠাট্টা করতে পছন্দ করি, কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করুক তা সহ্য করতে পারি না।'

'আমি ঠাট্টা করছি না।' বলল রানা।

'ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো তাহলে। চোখ যখন একবার দিয়েছে, তোমার রেহাই নেই। একমাত্র উপায়, এক ফাঁকে কোন ঝোপের আড়ালে নিয়ে যাও ওকে দশ মিনিটের জন্যে।'

'কি?'

'খাদুগুয়াঙের কিরা, ঠাট্টা না।'

'থাক,' রানা বলল, 'আর শুনতে চাই না।'

'তাজ্জব! তুমি চাও না ওই ডাকাতনী শিরিনের কাছ থেকে সরে থাকুক?'

রানা চুপ করে রইল।

'তা যদি চাও, ওটাই উপায়।

'ও না তোমার বোন?'

'বোন বলেই তো বলছি। চিনি যে!'

রানা প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করল, 'তেষ্টা পেয়েছে। পানি কতদূর?'

'এই এসে গেছি। দেখতে পাচ্ছ, সামনে তিন পাহাড়?' মিরহাম আঙুল তুলে দেখাল, 'উই যে!'

খানিকটা সামনে বনভূমি। তার পেছনে ঘন কালো রঙ। পাহাড়।

মিরহাম বকবক করছে আবার। মনোযোগ হারিয়ে ফেলল রানা। এবার সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

কিছু যেন অনুভব করছে রানা। গন্ধ পাচ্ছে বিপদের। শিরিনের ওপর উচা হ্লার অকারণ ক্রোধ, মিরহামের হিংস্র মেজাজ—এইসব সাধারণ কোনো বিপদ নয়, আরও গভীর, আরও ভয়ঙ্কর একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে, অনুভব করছে ও।

ভোর হব হব এই সময়টা, পাহাড় আর জঙ্গলে সাজানো এই জনহীন পার্বত্য এলাকা, এই প্রাণহীন নিস্তব্ধতা—এই সবের মধ্যেই কোথাও যেন ওত্ পেতে রয়েছে সেই বিপদ।

এক সময় হঠাৎ রানা আবিষ্কার করল, মো আ তার পাশে চলে এসেছে কখন যেন। মিরহাম চলে গেছে সামনে।

সাত

কড় কড় করে গর্জে উঠল একসঙ্গে অনেকগুলো রাইফেল। অকস্মাৎ। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। আধ মিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল মিরহামের দল।

এতই কাছ থেকে আক্রমণ এলো যে নাকে বারুদের গন্ধ, মুখের ভিতর তিক্ত, কটু ধোঁয়ার স্বাদ পেল ওরা।

সাংগু নদীর নাম মাত্র পানির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তীরে, বনভূমিতে

ঢুকতে না ঢুকতেই হঠাৎ এই আক্রমণ।

যুদ্ধ হলো না। মিরহাম কাঁধ থেকে নামালোই না তার রাইফেল। গুলি করছে শুধু কুতজার আর চয়া মং কিন্তু সে-ও অন্ধের মত।

পিছিয়ে পড়েছিল জামান। রানাও বেশ খানিকটা পেছনে ছিল। গুলির শব্দ হতে, ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করেছে নিজেদের খেয়াল-খুশি মত। প্রাণপণ চেষ্টা করে ঘোড়াটাকে একটু শান্ত করে ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল সবার পেছনে চলে গেছে মিরহাম।

জামানের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল রানা। গুলি খেয়েছে ঘোড়াটা, পড়ল হুড়মুড় করে। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ল জামান। রাশ টেনে ঘোড়াটাকে থামিয়ে ফেলল রানা, বাধ্য করল পেছন ফিরতে। পেছন ফিরেই দেখতে পেল, হামাগুড়ি দিচ্ছে জামান, আক্রমণকারীদের উদ্দেশে চিৎকার করে কিছু বলছে, কিন্তু কি বলছে শুনতে পেল না রানা। আহত হয়েছে কিনা তাও বোঝা গেল না ভাল করে।

পাশে চলে এল মিরহাম।

'ফিরলে কেন!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মিরহাম। 'আগে বাড়ো! সবাই চলে গেছে সামনে।'

দ্রুতবেগে এদিকে আসছিল একটা ঘোড়া, হঠাৎ খালি হয়ে গেল ঘোড়ার পিঠ। চয়া মং! পড়ে গেল সে, কয়েক গড়ান দিয়ে থামল দেহটা। সাদা সিল্কের চাদরটা টকটকে লাল হয়ে গেছে তার এক জায়গায়।

উচা হ্লা, মো আ বা শিরিন, কেউ নেই। কোথাও তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না রানা।

দাঁড়াল না আর মিরহাম। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। হঠাৎ রানা আবিষ্কার করল, সে একা।

আক্রমণকারী, কে জানে তারা কারা, গুলি ছুঁড়ে চলেছে অবিরাম। কানের পাশ দিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে বিন্ বিন্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেটগুলো। জামানকে আর দেখা যাচ্ছে না। তবে রাইফেলের আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে তার তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে আসছে। জামানের চিৎকারে স্বস্তির ছোঁয়া রয়েছে, অনুভব করল রানা। মনে পড়ল শিরিনের কথা। শিরিন কোথায় আছে, মিরহাম জানে। না জানলে রানাকে ফেলে চলে যেত না সে।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রানা।

তিন মিনিট পর অগ্রবর্তী দলটাকে দেখতে পেল ও। উচা হ্লা, মো আ, আর শিরিন। সবার পেছনে সিকুবা আ। মিরহাম?

কোথাও নেই সে।

দলটাকে ধরে ফেলল রানা কয়েক মিনিটের মধ্যে। শব্দ শুনে তাকাল পিছন দিকে।

মিরহাম। হাসছে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে।

একনাগাড়ে আধঘণ্টা ঘোড়া ছোটাবার পর উপত্যকা ছেড়ে তির্যক পাহাড়ের গা বেয়ে আধাআধি উঠে থামল দলটা।

নিচের দিকে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে রইল মিরহাম, বলল, 'দেখছ, রানা? পিচু নিল না মাইজ চাপাহ।'

চমকে উঠল রানা, 'কি?'

'মাইজ চাপাহ!' হাসছে মিরহাম, 'বুঝতে পারোনি?

'কি বলছ তুমি?' রানা বলল, 'পুলিস কোত্থেকে আসবে এত দূরে?'

'মাইজ চাপাহ, হেড কনস্টেবল, নিজের চোখে দেখেছি।' মিরহাম জানাল, 'ক্যাম্পে মাইজ চাপাহ কিছু লোককে রেখে বাকি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছিল এদিকে। ওঁৎ পেতে বসে ছিল নদীর ধারে।'

'কেন?'

'বোকা নাকি, তুমি, রানা?' মিরহাম অবাক হয়ে বলল, 'কেন, জানো না! আমাকে বন্দী করার জন্যে।'

'কিন্তু মিলছে না, মিরহাম।' রানা বলল, 'তোমাকে বন্দী করতে চাইলে এত দূরে এসে ফাঁদ পাতবে কেন? এর চেয়ে ভাল জায়গা চোখে পড়েনি তার?'

রানার কাঁধে প্রচণ্ড এক চাপড় মারল মিরহাম। 'দোস্তো, মিরহাম মার্মা এই প্রথম তার জীবনে দেখল এমন একজন লোক যে সত্যি মিরহাম মার্মার সমান বুদ্ধি রাখে।' অকৃত্রিম প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মিরহাম, 'নাহ্, তুমি একাই একশো। না মেনে পারি না। দোস্তো, কি সন্দেহ হচ্ছে তোমার?'

'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মাইজ চাপাহ-র উদ্দেশ্য অন্যরকম।'

'কি রকম?'

'যেতে চায় সে।

'ঠিক। থাম্পা মন্দিরে যেতে চায় সে—কেমন?' মিরহাম বলল, 'তাই যতটা সম্ভব এগিয়ে এসে ওঁৎ পেতে বসেছিল সে।'

'এখন কি করতে চাও?'

'জানি না, রানা।' মিরহাম বলল, 'সবকিছু এখন নির্ভর করে ওরা কি করতে চায় তার ওপর। মাইজ চাপাহ ভয়ানক লোকের ছেলে।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আর কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না। এখন থেকে গহীন জঙ্গল আর দুর্গম পাহাড় ডিঙিয়ে চলব আমরা। কঠিন রাস্তা। সহ্য করতে পারবে না তোমার শিরিন। ভাবছি, ওকে পুলিসের হাতে তুলে দিলে কেমন হয়?'

রানাকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে দেখল মিরহাম। উত্তর নেই।

'কি ভাবছ, দোস্তো?'

'যদি নিশ্চিত জানতাম, জামান বেঁচে আছে? গুলিটা কোথায় লেগেছে...'

জামানের সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছিল রানার, প্রথম সুযোগেই দল ত্যাগ করবে সে। সেই কথা অনুযায়ী সে পিছিয়ে থাকল কিনা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

'গুলি লেগেছে? জামান সাহেবের গায়? হাসাতে চেষ্টা কোরো না আমাকে, রানা। নিজের চোখে দেখেছি আমি, ইচ্ছা করে ঘোড়া থেকে পড়েছে সে। ঘোড়ার পায়ে রাইফেল বাধিয়ে ল্যাঙ মেরেছে সে। দুঃখ হচ্ছিল

তখন, খানিক থেমে গুলি করতে পারলাম না বলে।'

'গুলি লাগেনি বলছ?'

'থাদুয়াঙের কিরা।'

'সেক্ষেত্রে শিরিকে পাঠানো যেতে পারে। জামান সেখানে থাকলে ওর কোন বিপদ হবে না।'

'তবু, একজন গাইড থাকলে ভাল হয়।' মিরহাম বলল, 'তোমার দোস্তি চাই আমি, না? শিরিন নিরাপদে পৌঁছুল কিনা তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলে এগোবে কি করে?'

'কি বলতে চাইছ, মিরহাম? তুমি শিরিনকে পথ দেখিয়ে পুলিসদের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আসতে চাও?'

'চাই।'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?'

'এইখানে, এখুনি পারি শিরিনকে খুন করতে। আড়ালে নিয়ে গিয়ে খুন করব তা ভাবছ কেন?'

তা কেন ভাবছে রানা বলল না সে কথা।

'নিরাপদে ওকে পৌঁছে দেয়া যায় কিভাবে?' আবার জিজ্ঞেস করল মিরহাম। 'আছে কোন বুদ্ধি? কিংবা তুমিই যাও না কেন, রানা?'

'আমি?'

'তুমি।'

'বুঝলাম—ঠাট্টা করছ।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মিরহাম।

আসল কথায় এল রানা। 'শিরিন চলে গেলে, আমাকে বাধ্য করার অস্ত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে তোমার, তখন যদি থাম্পা মন্দিরে তোমাকে নিয়ে না যাই?'

'যাবে। ওকে ছাড়ার আগে কথা আদায় করে নেব আমি তোমার কাছ থেকে। আমি জানি, কথার বরখেলাপ হবে না তোমার।'

কথাটার মধ্যে এমন একটা সারল্য আর দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ পেল যে স্তম্ভিত না হয়ে পারল না রানা। রক্ত লোলুপ এই মানুষ নামের অযোগ্য পাষণ্ডটার চিন্তা ভাবনা কোন কোন ব্যাপারে এরকম বিস্ময়কর ভাবে সরল। সকালে সূর্য ওঠে, ডোবে রাতের আগে, ঘাস বড় হয়, পানি বয়, পাহাড়ের গায়ে লাথি মারলে ব্যথা লাগে, বৃষ্টি ভিজে, ধুলো শুকনো; তেমনি, রানা সৎ মানুষ—এইরকম সহজ ব্যাপার।

হাতের ইশারায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলে হাফপ্যান্টের বাঁ পা'টা তুলতে তুলতে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল মিরহাম।

'মা আত্তু নি পো আত্তুমা হাউকে মা নি নাই।'

ঘাড় ফেরাল রানা। ঠিক তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে উচা হ্লা। হাসছে। চোখে মুখে অদ্ভুত একটা উজ্জ্বলতা। ভঙ্গিতে অন্তরঙ্গ আমন্ত্রণ। ভাষা না বুঝলেও পরিষ্কার বুঝল রানা—এটা সহজ সরল, বন্য প্রেম নিবেদন।

'কিছু বলছ?'

'মা আং গো ইউ পো লা?' ফিসফিস করে বলল উচা হলা।

তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে? দুটো কথার একটাও বুঝল না রানা। দেখল দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে উচা হলা, দ্রুত ওঠানামা করছে বুক।

পিছন থেকে কনুই দিয়ে মারল মিরহাম উচা হলার পাঁজরে, ব্যথায় নীল হয়ে গেল মুখটা। একটা কথাও বলল না সে। পাঁজরে হাত দিয়ে শরীর বাঁকা করে সরে গেল সামনে থেকে।

'কেউ আসছে!' মো আ-র গলা শোনা গেল আড়াল থেকে।

নিচের দিকে তাকাল রানা।

বহুদূরে তিনটে কালো বিন্দু দেখা যায় কি যায় না। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকার পর মনে হলো বড় হচ্ছে বিন্দুগুলো। মিরহাম ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক ছাড়ল সিকুবা আ-র উদ্দেশে। কাছে আসতে সিকুবা আ-কে জিজ্ঞেস করল সে, 'দেখো তো, চিনতে পারো কিনা তুমি!' শকুনের চোখ বলে খ্যাতি আছে সিকুবা আ-র।

'পারি।' সিকুবা আ বলল, 'মাইজ চাপাহ! তার সঙ্গে দু'জন মুরং পুলিস। ঘোড়া দুটো খয়েরি রঙের, একটা কালো। একটা ঘোড়ার লেজ কাটা। মাইজ চাপাহ হাসছে।'

পাহাড়সদৃশ সিকুবা আ-র মুখ থেকে এটাই সবচেয়ে বড় বক্তৃতা শুনল রানা। কথা সে এর আগে বলেইনি। না, বলেছিল। মাতামুহুরী পেরোবার পর চয়া মং যখন বাধ্য করল তাকে চুচ্যাং তাগল, আসমান খান আর ওয়াকলাইয়ের লাশের সঙ্গে রড়ি আফার লাশ কবর দিতে, তখন।

'মিরহাম!' রানা বলল, 'শিরিনকে যদি ছেড়ে দিতে চাও—এই সুযোগ। আমরা এখান থেকে দেখতে পাব।'

'মাইজ চাপাহকে বিশ্বাস করি না। তবে, ও তোমার মেয়েমানুষ তুমি যা ভাল বোঝ, তাই হবে।'

ঘোড়া থেকে নেমে এগোল রানা শিরিনের দিকে।

'না!' চিৎকার করে উঠল শিরিন। 'অসম্ভব!'

কিছুতেই ফেরত যেতে রাজি ছিল না শিরিন। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল একসঙ্গে বিপদে পড়েছে ওরা দুজন, শেষ পর্যন্ত রানার পাশে থেকে বিপদের শেষ দেখতে চায় ও। এর ফলে যদি প্রাণ যায় তাও সই—এভাবে স্বার্থপরের মত নিজের প্রাণ রক্ষা করবে না সে কিছুতেই।

ওকে রাজি করাতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না রানার। রানার ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি, জামানকে গিয়ে কি বলতে হবে, গুণ্ডার মাধ্যমে কিভাবে খবর আদান-প্রদান চলবে, ইত্যাদি বুঝিয়ে দিতেই রাজি হয়ে গেল। রানা এমন ভাব করল, যেন দূত হিসেবে পাঠাচ্ছে সে শিরিনকে জামানের কাছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকায় নেমে এল রানা শিরিনকে নিয়ে। যতক্ষণ

না পুলিসের সাহায্য আসছে ততক্ষণ কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে পই পই করে বারণ করল শিরিন রানাকে। যেন আজই, আর খানিক বাদে দেখা হবে এমনি ভঙ্গি করে বিদায় দিল ওকে রানা। ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা হয়ে গেল শিরিন। পেছন পেছন চলল গুণ্ডা ইঙ্গিত পেয়ে। যতক্ষণ দেখা যায় চেয়ে থেকে ওপরে উঠে এল আবার রানা। স্বস্তি অনুভব করছে সে, হালকা হয়ে গেছে যেন ওর মাথার বোঝা।

পাশে এসে দাঁড়াল মিরহাম।

ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে শিরিনকে। চলে গেছে বহুদূর।

শিরিনকে এগোতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে মাইজ চাপাহ বাকি দু'জনকে নিয়ে।

শিরিন আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। তার পেছনে নেংটী ইঁদুরের মত দেখাচ্ছে গুণ্ডাকে।

পুলিস তিনজনের সঙ্গে মিলিত হলো শিরিন। মিনিট পাঁচেক চারটে কালো বিন্দু অনড় স্থির হয়ে রইল। তারপর দেখা গেল, ফিরে যাচ্ছে সবাই।

একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রানা।

দশ মিনিট পর হারিয়ে গেল বিন্দুগুলো।

'চিন্তা কোরো না, দোস্তো,' পিঠে চাপড় দিল মিরহাম। 'শিরিনের সঙ্গে আজই আবার দেখা হবে তোমার।'

'মানে?'

উত্তর না দিয়ে সিকুবা আ-র দিকে তাকাল মিরহাম, 'তুমি কি করবে! চয়া মং...'

'খবরদার! মরা মানুষের নাম না মুখে আনবে!' অকস্মাৎ খেপে উঠে কুঠার তুলল সিকুবা আ।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ভুল হয়ে গেছে।' তাড়াতাড়ি বলল মিরহাম, 'তোমার বন্ধু... সে যদি কথা বলতে পারত, হয়তো এখন তোমার কানে কানে পরামর্শ দিত ফিরে যেতে।'

'না।' সিকুবা আ কুঠারের হাতলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'সে যেতে বলে গেছে মন্দিরে।'

'তাই নাকি! আর কি বলে গেছে?'

'মনে নেই।'

'অ্যাঁ? মনে নেই? মনে নেই মানে?'

'আরও কিছু বলেছে। ভুলে গেছি।'

'ভুলে গেছ!' মুচকি হেসে মিরহাম বলল, 'স্মরণ করার চেষ্টা করো। সে হয়তো তোমাকে ফিরে যেতেই বলে গেছে।'

'না।'

হঠাৎ চরকির মত ঘুরল মিরহাম রানার দিকে, 'শুনলে?' কান খাড়া করে রেখেছে সে আরও কিছু শোনার জন্যে।

কিছু যেন শুনতে পেয়েছে রানাও, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল না।

বলল, 'কি?'

'কু-ও-ও-ও, তারপর, কি-ই-ই-ই—শুনতে পাওনি?'

'কিসের শব্দ?'

'এলাকাটা কুকীদের। পরস্পরকে ওরা কু-ও-ও-ও করে ডাকে কি-ই-ই করে উত্তর দেয়।'

'তাতে কি?'

'আমাদেরকে দেখেছে ওরা।' মিরহামকে বেশ উত্তেজিত মনে হলো, 'এই জায়গা ভাল না। হামলা হতে পারে।'

'কোন্‌দিকে আছে তারা বলো আমাকে।' মিরহামের মুখোমুখি দাঁড়াল সিকুবা আ।

'তোমার বুদ্ধি তো,' রানার দিকে তাকাল মিরহাম, 'উনি একা কুকীদের সাথে লড়বেন, বুঝলে কিছু?'

'কি করা উচিত এখন?' জানতে চাইল রানা।

'সরে যেতে হবে এখান থেকে। জায়গা জানা আছে আমার। আগে বাড়ো।'

প্রায় খাড়া চড়াই তেমনি ঢালু উৎরাই। পরপর তিনটে পাহাড় ডিঙোতেই লাগল পুরো দুই ঘণ্টা। বিস্তীর্ণ অসমতল উপত্যকার চারদিকে ছোট বড় পাহাড়। বাঁক নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো পাহাড়ের দিকে এগোল দলটা।

দুই পাহাড়ের মাঝখানে ঢুকে আঁকাবাঁকা পথ। মিরহাম আচমকা থামল একটা বাঁকের কাছে। ছোট্ট একটা সুড়ঙ্গ পথ সেঁধিয়ে গেছে একটা পাহাড়ের ভিতর। ঘোড়া থেকে নেমে গুহা-মুখের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। গুহা-মুখটা ভালমত পরীক্ষা করে হাসি ফুটে উঠল ওর পুরু ঠোঁটে।

'এই সেই জায়গা।' সবাইকে সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকতে নির্দেশ দিল সে হাত নেড়ে।

টের পেয়েছে রানা, রহস্যময় আচরণ করছে মিরহাম। কারণটা কি? অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে এগোতে এগোতে চিন্তিত হয়ে পড়ল ও।

পঞ্চাশ গজ পর বাঁক। একটা চমক অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে। বাঁক নিতেই আলো, লম্বা সবুজ ঘাস, নারকেল আর খেজুর গাছ, গাছের ফাঁকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ দীঘির পানি, শীতল ছায়া, পাখির কল-কাকলি—একসঙ্গে এত সব দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

পিঠে চাপড় মারল মিরহাম, 'মিরহাম মার্মা চেনে এই এলাকা। শত্রুর জন্যে আমরা অপেক্ষা করব এইখানে।'

'জানবে কিভাবে তারা, আমরা এখানে আছি?'

'জানবে। জানাবার ব্যবস্থা করব।' উচা হ্লার দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে আদেশ করল, 'গাছ কেটে চেলা কর্।' মো আ-কে বলল। 'আগুন জ্বাল।'

শিরিনকে বিদায় করে দেয়ায় যার-পর নাই খুশি হয়েছে উচা হ্লা। গুনগুন

গান গাইতে গাইতে ভারবাহী ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। নামাল একটা কাঠ কাটার কুঠার। দীঘির পাশেই বেছে নিল একটা গাছ। কোমরের বাম দিকে অনাবৃত ছ'আঙুল জায়গায় হাত ঘষল। তারপর গানের ছন্দে কোপ মারতে শুরু করল গাছের গায়ে। ছন্দোবদ্ধভাবে দুলছে কোমর-বুক-পেট। রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য দোলাচ্ছে বেশি করে।

কুঠারের শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

'বেরুবার পথ আছে আর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না।' মিরহাম বলল, 'এটা একটা ফাঁদ।'

এখানে পৌঁছে মিনিট দুয়েক কেঁদেছে সিকুবা আ চম্রা মং-এর শোকে। এখন ঠায় বসে আছে দীঘির দিকে চেয়ে। বিড় বিড় করে কথা বলছে আপন মনে। মিরহাম হাঁক ছাড়তেই কুঠার হাতে এসে দাঁড়াল।

'গুহার বাইরে জঙ্গলে লুকিয়ে বসে থাকো তুমি,' আদেশ করল মিরহাম। 'চারদিকে নজর রাখবে। শত্রু এলেই খবর দেবে আমাদের।'

মিরহামের কথা শেষ হতেই রানার দিকে ফিরল সিকুবা আ। 'তুমি বলো।'

বিস্ফারিত হয়ে গেল মিরহামের চোখ। 'রানা বলবে কেন? আমি সর্দার। আমি বলব।'

'মরা বন্ধু বলে গেছে, রানাকে মানবে, বিশ্বাস করবে, আর কাউকে না। আরও কি যেন বলেছিল, ভুলে গেছি। রানা, তুমি বলো—যাব কি না যাব?' সরল বিশ্বাসে চেয়ে রয়েছে দৈত্যটা রানার মুখের দিকে।

বিপদে পড়ল রানা। মিরহামের মুখের দিকে চাইল।

'ওকে যেতে বলো, রানা। ও শুনবে তোমার কথা।' গম্ভীর মিরহাম।

'মিরহাম যা বলেছে তাই করো তুমি, সিকুবা আ। পাহারা দাওগে গুহামুখ।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল সিকুবা আ। হাতে কুঠার।

দুটো চুরুট বের করল মিরহাম। নিজে ধরাল একটা, রানাকে দিল একটা। মো আ-কে চা বানাতে বলে রানার হাত ধরে নিয়ে গেল দীঘির পাড়ে। সবুজ ঘাসের ওপর বসে পড়ল দু'জন। রানাকে এমন জায়গায় বসাল মিরহাম যাতে সে চোখ তুললেই দেখতে পায় উচা হ্লাকে এবং দেখতে দেখতে আকৃষ্ট হতে পারে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে চুরুট টানল ওরা। যার যার চিন্তায় ডুবে গেছে দু'জনই। দুটো মগে করে চা দিয়ে নাস্তা তৈরির কাজে লেগে গেছে মো আ। চর্বিতে ভাজা হচ্ছে বড় বড় মাংসের টুকরো, পুরু আটার রুটি।

কয়েকটা বুনো হাঁস ঝপাং ঝপাং করে নামল দীঘিতে, পরমুহূর্তে ডোবাড়ুবি খেলা শুরু হয়ে গেল। ওপারে কাশফুল হাওয়ায় দুলছে। মনোরম একটা শীতল, শান্ত, ছায়া-সুনিবিড় পরিবেশ। হাতছানি দিয়ে ডাকছে স্বচ্ছ দীঘির পানি।

অনেকক্ষণ পর মিরহাম বলল, 'কথা বলতে ইচ্ছা করছে আমার। কি

করি?'

'তোমাদের লাল পাহাড় আর মন্দিরের গল্প শোনাও।'

'জানো না তুমি?'

'জানি। এক ইংরেজ লেখকের একটা বই আছে এই মন্দিরের ওপর। মর্গানের অভিযানের কাহিনী লেখা আছে তাতে। জামানের কাছ থেকেও শুনেছি পুরো গল্পটা। একটার সঙ্গে একটার মিল নেই।'

'মিল তুমি পাবে না, রানা। থাম্পা মন্দিরের এব হাজার একটা গল্প এই এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ বলে মন্দির আছে ঠিকই, কিন্তু দেবতারা মন্দিরটাকে শুধু পূর্ণিমার রাতে পৃথিবীতে নামিয়ে আনে, মাসে একবার। কেউ বলে, নেই। কেউ বলে মর্গানকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল একজন মার্মা যুবক, কেউ বলে রড়ি শামান আর তার দলবল মর্গানকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরে বলি দেবে বলে। অত কথায় কাজ নেই, আমি যেটা বিশ্বাস করি, শোনো। কোন্ গল্পটা সত্য আর কোন্টা মিথ্যা, আমরা তো জানবই। গেলেই বোঝা যাবে। তাই না?'

'তাই।'

মিরহাম বলতে শুরু করল।

মর্গানের জন্ম, পেশা, চরিত্র এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানাজন নানা কথা বলে। মিরহামের ধারণা, বর্মাতেই তার জন্ম, বন্দুক রাইফেল মেরামতের কাজ করত। জাপানি বোমার ভয়ে এদিকে পালিয়ে আসে সে ত্রিশজনের একটা দল নিয়ে। সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।

সন্ধ্যার সময় বর্ডার পেরিয়ে গভীর রাতে আশ্রয় নেয় ওরা এক পাহাড়ের গুহায়। মার্মাদের একটা দল ওই গুহা আক্রমণ করে। প্রচণ্ড লড়াই হয় দু'দলে। দশজন মারা পড়ে মর্গানের দলের। মার্মাদের সংখ্যা ছিল বেশি, রাইফেল ছিল কম। তাই তাদের দলে নিহত হয় ত্রিশজনের ওপর। বন্দী হয় মাত্র একজন—সতেরো আঠারো বছরের এক ছোকরা।

অচেনা দেশ, সাথে ম্যাপ নেই, জানা নেই কোন্ পথ ধরে কোন্ দিকে যাওয়া যায়, মর্গান সেই ছোকরাকে খুন না করে বন্দী করে রাখল। ছোকরাটা ছিল রিগ্রাইস্তা গোত্রের। নাম হংগ। কূট-কৌশল প্রয়োগে ওই বয়সেই হংগের জুড়ি ছিল না। অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে পারত, দিনকে রাত বলে প্রমাণ করতে পারত কথায় কথায়। নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সে মর্গানকে স্থানীয় উপজাতি, তাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম বিশ্বাস, জাতিগত গোপনীয়তা—সব বলতে শুরু করে। থাম্পা মন্দিরের রুবির গল্পও সে শোনায়।

মর্গান কথাচ্ছলে জানতে চায় সেই মন্দিরে হংগ গেছে কিনা। হংগ জবাব দেয়, মার্মাদের তৈয়ংসিয়ট গোত্রের লোকেরা তাকে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল একবার। সেখানে সে নিজের চোখে দেখে এসেছে মন্দির। মন্দিরের ভিতর উজ্জ্বল লাল পাথর আছে হাজার হাজার। হংগের সামনে বিদেশী কিছু লোককে বলি দেয়া হয়। ফেরার সময়ও চোখ বাঁধা ছিল সবার, কিন্তু বাঁধনটা আলগা

করে চিনে নিয়েছে সে মন্দিরের প্রবেশ পথ।

মর্গান নিজেদের লোকজনকে গল্পটা শোনায়। সবাই উৎসাহী হয়ে শোনে। গল্প শেষ হতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সবাই।

মর্গান জিজ্ঞেস করে, মন্দিরে যাবার রাস্তাটা এখনও তার মনে আছে কিনা। হংগ জানায়, আছে। তবে সে-পথে বিদেশী কোন মানুষের যাওয়া উচিত নয়। গেলে কেউ ফেরে না। ফেরেনি আজ পর্যন্ত।

হংগের কথায় কান দেয়নি ওরা। পরদিন সকালেই থাম্পা মন্দির অভিমুখে রওনা হয়ে যায় দলটা। প্রথমে রাজি না হলেও ওদের নিয়ে যেতে রাজি হয় শেষ পর্যন্ত হংগ। শর্ত থাকে, রুবি মন্দিরে পৌঁছে দিলে মর্গান তাকে একটা ঘোড়া, প্রচুর খাবার, আর একটা রাইফেল দেবে। মর্গানের হাতঘড়িটাও দাবি করে সে। রাজি হয় মর্গান।

ফলেনদাওয়াং থেকে যাত্রা শুরু করে মাতামুহুরী পেরিয়ে অলিকদাম। অলিকদাম থেকে দুই মিনারওয়ালা পাহাড় দেখা যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্র একটি জায়গা থেকে। মর্গান বা তার দলের কেউ সেটা দেখেনি। রড়ি শামানের কাছে পরে নাকি হংগ স্বীকার করেছিল, সে দেখেছিল কিন্তু কাউকে বলেনি কথাটা। তারপর সাঙ্গু নদী অতিক্রম করে সাতদিন এগোল ওরা। অলিকদাম থেকে ঘোড়া কিনেছিল মর্গান হংগের সহায়তায়। সেখান থেকেই ছড়ায় অভিযানের কথা। শেষ পর্যন্ত তৈয়ংসিয়ট গোত্রের রড়ি শামানের কানেও ওঠে। দেরি না করে রড়ি শামান দলবল নিয়ে রওনা হয়ে যায় থাম্পা মন্দির অভিমুখে।

'মার্মাদের গোত্র ক'টা মোট?' রানা জানতে চায়।

'রিগ্রাইস্তা, পালেংগস্তা, পালেং গ্রীস্তা, কাউক দিনস্তা, ভেইর্যেনস্তা, সারুংগস্তা, ফারান প্রোস্তা, খিউকাপি আস্তা, ছেড়েং গস্তা, মারুতৃস্তা, ক্রংখিয়াংস্তা, সাবোস্চস্তা, তৈয়ংসিয়ট, খিয়ফমস্তে, মাহলংস্তা…'

'থাক, থাক।'

মুচকি হেসে মিরহাম বলল, 'আরও আছে, অনেক। আমার মা তৈয়ংসিয়ট গোত্রের মেয়ে। রড়ি শামান আমার মামা।'

'মর্গানের কথা বলো।'

'অলিকদাম থেকে চব্বিশ মাইলের পথ। কিন্তু এক দিন দু'দিন করে সাত দিন, চোদ্দ দিন, একুশ দিন পেরিয়ে গেল। হংগ বলে আরও সামনে। দুই মিনারের মত দেখতে পাহাড়ের চুড়ো কিন্তু চোখে পড়ে না। মর্গানের মনে সন্দেহ দেখা দিল। কিন্তু পথ-ঘাট অচেনা, পার্বত্য এলাকা, হংগের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায়ও নেই।'

'অলিকদাম থেকে একুশ দিন হেঁটেও দুই মিনার বিশিষ্ট পাহাড় না দেখতে পাবার কারণ?' জিজ্ঞেস করল রানা

মিরহাম ব্যাখ্যা করে বলল।

'হংগ হারামি ছেলে। ঘুর-পথে নিয়ে যাচ্ছিল সে দলটাকে। যাতে পরে আর দলের কেউ পবিত্র মন্দিরে যেতে না পারে। যাক, বাইশ দিনের দিন, মর্গান দেখতে পেল মিনার দুটো। এর আগেই হংগ বলে রেখেছিল, ওই

পাহাড়ের কাছ থেকে সাতদিনের পথ থাম্পা মন্দির। আসলে তা নয়, পথ মাত্র তিন দিনের।

'দুই মিনারের কাছ থেকে রওয়ানা হলো ওরা। একে একে কাটল সাতদিন। মর্গান জিজ্ঞেস করে, আর কতদূর? হংগ বলে, আর একদিনের পথ। আমরা খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছি কিনা।

'আরও একটা দিন কাটে। সন্ধ্যা নামে। হংগ বলে, আরও একদিন সময় লাগবে।

'তিন দিন এভাবে পার্বত্য এলাকা চষে ফেলার পর হংগ বলে, আমি ভুলে গেছি। তবে কাছে পিঠেই কোথাও আছে পবিত্র মন্দিরে ঢোকার গোপন দরজা।

'মর্গান খুন করতে চায় হংগকে। কিন্তু দলের অন্যান্যরা তাতে রাজি হয় না।

'এরপরও পাঁচ ছ'দিন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করে হংগ দলটাকে নিয়ে। প্রাচীন, ধ্বংস-প্রাপ্ত একটা মার্মা গ্রাম দেখে তারা। তারপর দেখে লাল পাথরের বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই তেপান্তরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা রাস্তা বর্মার শহর অভিমুখে। হংগ জানায়, এই পথ দিয়ে গেলে বাজার পাওয়া যাবে, কেনা যাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

'তারপর, দুই দিন কাটে। পরদিন সকালে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অস্বাভাবিক সরু একটা পথের ভিতর দলটাকে নিয়ে প্রবেশ করে হংগ। পথটা এতই সরু যে ঘোড়ায় বসে দু'দিকের পাহাড়ের গা ছোঁয়া যায় দু'হাত দিয়ে। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। দুই ঘন্টার রাস্তা। এই পথের শেষেই পাহাড়ের প্রাচীর। প্রাচীরের গায়ে গুহা-মুখ, একটা নয় এগারোটা। কিন্তু মাত্র একটা দিয়েই পৌছানো যায় রুবি মন্দিরে। বাকিগুলোয় কেউ ঢুকলে, গোলক-ধাঁধায় আটকা পড়ে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।'

'মা থামা চাবে লা?' মিরহাম মো আ-কে জিজ্ঞেস করল, খেয়েছ?

'মা চাচী।' মো আ উত্তর দিল, আমি খাইনি।

'না মা আতু চা পো।' একসঙ্গে খাব. মিরহাম বলল। রানার দিকে ফিরে শুরু করল আবার, 'এরপরের কাহিনী তো জানাই আছে তোমার। মর্গান পরে বলে...'

সারমর্ম এই রকম: মর্গান বলে, ডান দিক থেকে দুটো পাথরের পরেরটা অর্থাৎ তিন নম্বরটা সরাবার পর গুহামুখ দেখতে পায় ওরা। কিন্তু অধিকাংশ উপজাতিদের ধারণা, উল্টো বুঝিয়েছিল হংগ, মর্গান খেয়াল করেনি।

নির্দিষ্ট পাথরটা সরিয়ে গুহায় প্রবেশ করে ওরা। গুহার অপরদিকের মুখের সামনে দলটা পৌছোয়, দেখতে পায়, নিচে, অনেক নিচে গাছপালা, জলপ্রপাত, নদী, লালপাহাড় ও মন্দিরের চুড়ো।

'থাম্পা মন্দির?'

'থাম্পা মন্দির।'

মিরহাম বলে চলে: 'গুহা যেখানে শেষ হয়েছে, পাহাড় প্রাচীরের গায়ে

সেখান থেকে ঢালু পথ নেমে গেছে। এই পথটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। কোথাও মাত্র কয়েক ইঞ্চি চওড়া, কোথাও কয়েক হাত। সোজা নয়, একবার এদিক, আবার ওদিক।' ইংরেজি 'Z' অক্ষরের মত চিহ্ন এঁকে দেখাল মিরহাম। 'গুহামুখ থেকে নামার সময় সবাই দেখতে পায়, জলপ্রপাত একটা নয়, দুটো। একটা পাহাড়ের মাঝখান থেকে নামছে, অপরটা মাথা থেকে। হংগ হাজারবার নিষেধ করে দেয়, ওপরের দিকে কেউ যেন না তাকায়।'

'মন্দিরের মধ্যে মানুষ ছিল?'

'না।'

'গুহামুখ থেকে পাহাড়ের গা ধরে ধরে নামতে শুরু করে দলটা। হংগ ফিরে যেতে চায়। কিন্তু মর্গান রুবি না দেখে তাকে ছাড়তে রাজি হয় না।

'নিচে নামে ওরা। ঘাসের ওপর, নদীর পাড়ে জঙ্গলের ভিতর তিলের মত থেকে শুরু করে মারবেল পাথরের মত ছোট বড় অসংখ্য চুনি পাথর দেখতে পায় ওরা। পাগলের মত নাচানাচি শুরু করে দেয় দলটা, কুড়িয়ে পকেটে ভরতে থাকে পাথর। মন্দিরটা খুব বড় নয়। কিন্তু খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক কণা ধুলোও ছিল না সেখানে। দেবতার একটা মূর্তি মন্দিরের ভিতর। পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসা। সামনে একটা রুপোর বেদী। বেদীর ওপর জমাট রক্ত, শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। এই বেদীর নিচেই জমানো আছে চুনি পাথর।

'রুপোর বেদীটা আসলে গুপ্ত-ভাণ্ডারের ঢাকনি ছাড়া কিছু নয়। হংগের কথায়, বেদীটা সরানো হয়।

'নিচে একটা ঘর দেখে সবাই। আকারে পাঁচ হাত চওড়া, দশ হাত লম্বা। মেঝের ওপর ছোট্ট একটা পাহাড়ের মত করে সাজানো আছে রাঙা রুবি, অমূল্য পাথর। বাঘের ছাল দিয়ে ঢাকা।

'মর্গান পরদিন সকাল অবধি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু হংগ ঘোড়া, ঘড়ি, খাবার, আর রাইফেল নিয়ে বিদায় নেয়। উঠে যায় সে বিপজ্জনক আঁকাবাঁকা পথ ধরে।

'কেউ কেউ বলে, হংগ এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু মিরহামের ধারণা, কথাটা বাজে। রড়ি শামান তাকে গুহামুখের কাছ থেকে কয়েক মাইল দূরে খুন করে।

'পরদিন সকালে বস্তাতে ভরা হলো রুবিগুলো। কিন্তু ফিরতি যাত্রা শুরু করা সম্ভব হলো না, কারণ, খাবার দাবার প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনেক আলোচনার পর স্থির হলো, ডেভিডসনের নেতৃত্বে ছ'জনের একটা দল ওপরে উঠবে, তারা যাবে লাল পাথরের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে কুর্মী শহরের দিকে, সেই শহরে। খাবার দাবার কেনাকাটা করে ফিরে আসবে তারা। দশ দিন বরাদ্দ করা হলো তাদের জন্যে।

'থাম্পা মন্দিরে রয়ে গেল চোদ্দজন। খাবার যা ছিল, এই কজনের দশ দিনের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু দশদিন ছাড়িয়ে এগারো দিন কাটল, দেখা নেই ডেভিডসনের। চিন্তিত হয়ে উঠল মর্গান। বারোদিনের দিন বিপজ্জনক পথ ধরে

ওপরে উঠল সে। গুহামুখের বাইরে দেখতে পেল সে ডেভিডসনের দলটাকে। প্রত্যেকের ধড় থেকে আলাদা করা হয়েছে মুণ্ড।

'ছ'টা লাশ দেখে মর্গান আতঙ্কিত হয়ে পিছিয়ে যায়। গুহার অপর মুখের কাছে এসে নিচে তাকাতেই, নারকীয় কাণ্ডটা চাক্ষুষ করে সে। নিচে, অনেক নিচে, লাল মন্দির। মন্দিরের চারপাশে ছুটোছুটি করছে আর চিৎকার করছে মর্গানের লোকেরা। তাদেরকে ধাওয়া করে ধরে রাম দা-এর এক এক কোপে হত্যা করছে শ'দুয়েক উলঙ্গ মার্মা।

'মর্গান পালাতে শুরু করে। এগারোটা গুহামুখের কোন একটিতে ঢুকে পড়ে সে। তিনদিন তিনরাত সেখানে কাটিয়ে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় সে ওই এলাকা ছেড়ে।'

গল্প শেষ করে মিরহাম বলল, 'মর্গান পরে আবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে লুকানো সেই সরু পথটা কিছুতেই খুঁজে পায়নি আর।'

রানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানতে চাইল, 'কিন্তু মার্মারা নিচের ওই মন্দিরে গেল কোন্ পথে? পথ কি দুটো?'

'না।' মিরহাম বলল, 'পথ একটাই। দুটো পথের কথা কেউ বলেনি আজ পর্যন্ত। আমার ধারণা, মার্মারা রাতের অন্ধকারে নেমেছিল নিচে, ডেভিডসনের দলটাকে হত্যা করার পর। নেমে লুকিয়ে ছিল কোথাও।'

'হংগ ওপরের জলপ্রপাতের দিকে তাকাতে নিষেধ করল কেন?'

'কিংবদন্তী আছে, ওপরের জলপ্রপাতের কাছে দেবতারা বসে থাকেন। তাঁদের দিকে কেউ তাকালেই তাঁরা অভিশাপ দেন। নিয়ম আছে, কোন মার্মা থাম্পা মন্দির পাহারা দিতে পারবে না। পাহারা স্বয়ং দেবতারাই দেন।'

'রড়ি শামানের দলে ছিল দুশো মার্মা, তারা সবাই কি সৎ ছিল? তাদের মধ্যে কেউ···।'

'সম্ভব ছিল না ফিরে যাওয়া। রড়ি শামান ওদের চোখে কাপড় বেঁধে দিয়েছিল। তাছাড়া, সময়টা ছিল রাত্রি।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফুটল মিরহামের চোখে, 'রানা, রড়ি আঁফার নকশার সঙ্গে মিলেছে কিনা?'

'প্রায়।' মুচকি হাসল রানা।

গম্ভীর গলায় মিরহাম বলল, 'রড়ি আঁফা এখন সেখানে।

'মানে?'

'যারা পবিত্র মন্দিরের রহস্য জানে, মারা যাবার পর, ভূত হয়ে চলে যায় থাম্পা মন্দিরে। পাহারা দেয় তারা, দেবতার সঙ্গে।'

'খিদে পেয়েছে,' বলল, রানা, 'ওঠো।'

'গোসল করবে না? বলেই উঠে দাঁড়াল মিরহাম। ইঙ্গিতে ডাকল গো আ-কে। ওর কাছে রিভলভারটা দিয়ে অসঙ্কোচে ন্যাংটো হয়ে ঝাঁপ দিল সে টলটলে পানিতে। গলা পানিতে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ল। 'কি হলো, দোস্ত? কাপড়টা ছেড়ে চলে এসো। দেখা যাক, কে কার আগে সাঁতরাতে পারে।'

এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে উচা হলাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে মিরহামের মতই দিগম্বর হয়ে গেল রানাও, সমারসল্ট ডাইভ দিয়ে পড়ল

পানিতে।

'তোমার দেহ বড় সুন্দর তো, রানা!' প্রশংসাসূচক মুখভঙ্গি করল মিরহাম। 'সাঁতার আমি ভাল পারি না, তোমার সঙ্গে পারব না, জলে নামাবার জন্যে বলেছি কথাটা।'

'ওসব বললে চলবে না। নামিয়েছ যখন পাল্লা দিতে হবে। লম্বালম্বি দীঘির ওই পাড় ছুঁয়ে ফিরে আসতে হবে।'

'ওরেব্বাপ! এর অর্ধেক গেলেই ডুবে যাব। কিন্তু ঠিক আছে, পাল্লা দিতে মিরহাম ডরায় না। রেডি, ওয়ান টু থ্রী!'

এক মিনিটেই বিশ হাত পিছনে পড়ে গেল মিরহাম, দ্বিতীয় মিনিটে প্রায় ষাট হাত। হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেল মিরহাম, বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল রানা চোখের আড়ালে।

ফ্রিস্টাইলে সাঁতরে এসে তীরে হাত ঠেকতেই উঠে দাঁড়াল রানা, পেছন ফিরে খুঁজল মিরহামকে। অনেক আগেই সে রণেভঙ্গ দিয়েছে বুঝতে পেরে হাসল। গোটা দুই ডুব দিয়ে গা-হাত-পা কচলে নিয়ে রওয়ানা হতে যাবে এমনি সময় খিলখিল হাসি শুনে ফিরল পেছন দিকে।

রানার জামা-কাপড় বগলে চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, উচা হ্লা। হাসছে দেহ কাঁপিয়ে। বাঁ হাতে খুলে ফেলল পরনের সারং। ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতর! লোভ, সেই সঙ্গে কেমন একটা বিতৃষ্ণাও জাগল মনের মধ্যে। এমন নির্লজ্জ কামুকতা ঠিক যেন মানায় না নারীকে—হোক না জংলী, পাহাড়ী মেয়ে। প্রথমদিন থেকেই সেক্সম্যানিয়াক বলে মনে হয়েছে ওর মেয়েটাকে।

হাতের কাপড়গুলো মাটিতে ফেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল উচা হ্লা পানিতে। পাশ কাটিয়ে তীরে উঠে যাচ্ছিল রানা, ডুব দিয়ে ওর একটা পা ধরে টান দিল উচা হ্লা। বুক পানিতে চলে এল রানা। দু'হাতে ঝাপটে ধরল ওকে রাক্ষুসী মেয়েটা, পিষে ফেলতে চাইছে রানাকে নিজের দেহের সঙ্গে। দুই পায়ে জড়িয়ে ধরল রানার কোমর। মুখ দিয়ে বিচিত্র, দুর্বোধ্য টুকরো শব্দ উচ্চারণ করছে, চুমো খাওয়ার চেষ্টা করছে রানার ঠোঁটে। তপ্ত নিঃশ্বাসে তাড়ির গন্ধ।

মাথাটা ঘুরে উঠল রানার। কামার্ত নারীর বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একবার ভাবল, যাই ভেসে। লোভ হলো। সক্রিয় ভাবে সাড়া দিতে গিয়েও হঠাৎ সামলে নিল নিজেকে। সংযমের বাঁধ ভাঙতে গিয়েও ভাঙল না। পাশবিকতা মনে হলো ওর কাছে ব্যাপারটা। মনে হলো নোংরামি—ভাল লাগার ধার না ধেরে যার-তার সঙ্গে দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে নেয়া।

রানাকে নিস্পৃহ দেখে নিজের ভাষায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলল উচা হ্লা—'আমি তোমাকে ভালবাসি, আমাকে একটু ভালবাসো, এসো প্রেম করি।' দৃঢ় হাতে নিজেকে নিষ্পেষণমুক্ত করল রানা, জোর করে ছাড়িয়ে দিল ওর উরুর বন্ধন।

মুহূর্তে কালো হয়ে গেল উচা হ্লার মুখটা। কল্পনাও করতে পারেনি সে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করবে ওকে রানা। ঠাস করে চড় মারল রানার গালে।

'গা রে কেয়া পো?'

অর্থাৎ, আমাকে স্পর্শ করাও পাপ? উত্তরের অপেক্ষা না করে তীরে উঠে গেল সে টালমাটাল পা ফেলে। যেখানে ছিল, সেইখানেই পড়ে রইল দুজনের জামা-কাপড়। একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে একরোখা ভঙ্গিতে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল উচা হ্লা, হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

মনটা খারাপ হয়ে গেছে রানার, মনে হচ্ছে কেউ যেন কালি লেপে দিয়েছে সারা মনে। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে গলা পানিতে। ছোট ছোট মাছ সাহসী হয়ে ঠোকর দিচ্ছে পায়ে। উঠে পড়ল রানা। কুকুরের মত গা ঝাড়া দিয়ে যতটা সম্ভব পানি ঝরিয়ে নিয়ে কাপড় পরে ফেলল। ধীর পায়ে তীর ধরে হেঁটে ফিরে এল আগুনের কাছে।

খেতে বসেছে মিরহাম। রানাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে ওরও খাবার দিল মো আ। মিরহামের মুখোমুখি খেতে বসল রানা। এদিক ওদিক তাকাল খেতে খেতে। কোথায়ও নেই উচা হ্লা।

খাওয়া শেষ করে চুরুট ধরাল দু'জন। কারও মুখে কথা নেই। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে রানা। মিরহাম এবং মো আ-ও মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

আধ ঘন্টা হয়ে গেল, দেখা নেই উচা হ্লার। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙল মিরহাম, 'রানা?'

মুখ তুলে তাকাল রানা।

'কি করেছ? কি হয়েছে তোমাদের মধ্যে?'

'কিছুই না।'

'বলো, রানা।' প্রশ্নটা আবার করল মিরহাম।

'বললাম তো, কিছুই হয়নি।'

'তোমার পিছু নিয়েছিল উচা হ্লা। ওই আড়ালে। আমরা দুজনেই দেখেছি। ওকে চিনি, তাই বাধা দিইনি। কিছু বলিনি। ও তোমাকে চেয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম, তুমিও...'

বাধা দিল রানা, 'না। সে রকম কোন ইচ্ছা আমার ছিল না।'

মিরহাম চেয়ে আছে। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে তার। অনেক, অনেকক্ষণ পর পাথরের ওপর ছোরা ঘষল যেন কেউ, 'কি হয়েছে?'

ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে, অনুভব করতে পারছে রানা। বুঝতে পারছে একটা কিছু অমঙ্গল ঘটেছে, এবং সেজন্যে দোষী সাব্যস্ত করা হবে ওকে। মিরহাম ও মো আ দুজনেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

'ওকে নিরাশ করি আমি।' ধীরে ধীরে বলল রানা, 'দৌড়ে উঠে গেল পাহাড় বেয়ে গাছপালার আড়ালে। উলঙ্গ অবস্থায়।'

চোখাচোখি হলো মিরহাম আর মো আ-র মধ্যে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল মিরহাম।

'সর্বনাশ! আগে বলোনি কেন, রানা! এসো, এখনও হয়তো সময় আছে...'

'সময়?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'কিসের সময়?'

'দানবটার হাত থেকে উচা হ্লাকে উদ্ধার করবার।' মিরহাম কাঁপা গলায়

বলল, 'তোমার কাছে অপমানিত হয়ে সে গেছে সিকুবা আ-র কাছে। সিকুবা, ওই দৈত্যটা, মেয়েমানুষের শরীর নিতে জানে না! উচা হ্লা তাকে বাধ্য করবে, আর···আর···' ছুটল মিরহাম।

কেউ যেন পিছন থেকে কলার চেপে টেনে ধরল মিরহামকে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানাও।

গুহা-মুখের দিক থেকে হেঁটে আসছে বিশাল ঘোড়ামুখো দানবটা। সিকুবা আ। বোকা বোকা মুখের চেহারা, পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে ধরে রেখেছে একটি নগ্ন নারীদেহ।

উচা হ্লা, সন্দেহ নেই।

সিকুবা আ কাছে এগিয়ে আসছে, মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক।

রানার বিস্ফারিত চোখের সামনে এসে দাঁড়াল সিকুবা আ। ভাঙা গলায় বলল, 'মরে গেছে, হঠাৎ!'

আট

অগোছাল ভাষায় ঘটনাটা বর্ণনা করল সিকুবা আ।

যা ভয় করেছিল মিরহাম, তাই ঘটেছে। সিকুবা আ তার জীবনে কোন মেয়ের সঙ্গে মেশেনি, জানে না সে কিভাবে কি হয়। এমনই বিশাল আর, ভয়ঙ্কর তার চেহারা যে কোন মেয়ে-মানুষ ভুলেও ঘেঁষেনি তার কাছে। ঘোড়ার আদলে মুখ, সবাই তাকে ভয় করে। সে-ও ভয় করে মেয়েমানুষদের।

উচা হ্লা নগ্ন হয়ে তার কাছে যায়। সিকুবা তাকে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু উচা হ্লা তাকে বার বার অনুরোধ করে, বলে, ভয় নেই, ভয় নেই··· সিকুবা আ ভাবে, সত্যি বুঝি ভয়ের কিছু নেই। উচা হ্লা নিজের হাতে তার কাপড় খুলে দেয়। সিকুবার হাত ধরে নিজের গায়ে ঠেকায়, নিজের হাত সিকুবার শরীরে ছোঁয়ায়। তারপর কি ঘটেছে, ঠিক স্মরণ করতে পারে না সিকুবা আ। একসময় সে দেখে, তারা দু'জনেই পাথরের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। দু'জনেই হাঁপাতে শুরু করে, গোঙাতে শুরু করে। কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারে না সিকুবা আ। যেন দুই জানোয়ার মারামারি করছে হিংস্র আক্রোশে। এক পর্যায়ে ভয় পেয়ে যায় উচা হ্লা, বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু নিজেকে থামাতে পারে না সিকুবা আ। চরম মুহূর্তে উচা হ্লাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে সে। তাকে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে। তখন ওর ঘাড়ের কাছে একটা শব্দ হয় মট্ করে। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় উচা হ্লার, নড়াচড়া থেমে যায় তার। উচা হ্লা চেয়ে ছিল তার দিকে। চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে যায়।

বোকা হলেও, সিকুবা আ বুঝতে পারে, উচা হ্লাকে মেরে ফেলেছে সে।

লাশটা পরীক্ষা করল রানা। ডেড। মুখ তুলে দেখল, সিকুবা আ অঝোরে

কাঁদছে।

মিরহামের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। মো আ মিরহামের অপর পাশে। সিকুবা আ ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অদম্যভাবে ফোঁপাচ্ছে।

'কাঁদাকাটির কিছুই নেই, সিকুবা,' বলল রানা। 'তোমার দোষে মরেনি উচা হ্লা। ঘটনাটা দুঃখজনক, কিন্তু তোমার কিছুই করার ছিল না। চলো, পানির ধারে গিয়ে বসি আমরা। তোমার বন্ধুর কথা মনে আনো, সে আমাকে বিশ্বাস করত। জানো তো?'

মাথা ঝাঁকাল সিকুবা আ। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'জানি। কথাটা সত্যি। সে আমাকে বলে গেছে তোমার কথা মতন চলতে। সে আমাকে আরও কথা বলে গেছে, কিন্তু কথাটা এত চেষ্টা করেও মনে না আনতে পারছি। অথচ কথাটা খুব, খু-উ-ব জরুরী আর গুরুতর, আর...'

শব্দ খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল সিকুবা আ। তারপর বলল, 'আমার মাথাটা কাঁচা, মগজের অভাব আছে।'

'কে বলেছে?' রানা বলল, 'তুমি আমাদের মতই বুদ্ধিমান। মাথাটাকে আমাদের মত খাটাও না, এই যা। তার ফলে, আমাদের চেয়ে সুখী মানুষ তুমি। চলো, ওদিকে গিয়ে বসি।'

সিকুবা আ মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করল। পা বাড়াল দু'জন।

'দাঁড়াও!' মিরহামের ভারী গলার আদেশ এল ওদের পিছন থেকে, 'কি ভেবেছ তুমি, রানা? আমার বোন মারা গেছে। কেন মারা গেছে, কিভাবে মারা গেছে...!'

'ঘাড় ভেঙে দিয়েছে সিকুবা আ আদর করতে গিয়ে, উত্তেজনার মাথায়। ও ইচ্ছা করে করেনি কাজটা। কোন অপরাধ নেই ওর।'

'জানি, জানি!' বিড় বিড় করে বলল মিরহাম, 'সেসব আমাকে শেখাতে হবে না। কিন্তু...'

'অপরাধ নাই?' মো আ তেড়ে এল রানা আর সিকুবা আ-র দিকে, 'মিরহাম, ওরে ওই শুয়োর ছানা, ঘোড়ামুখো রাক্ষসটার মাথায় একটা সীসার টুকরো ঢুকিয়ে দিতে পারছিস না? এহ্ হে-হে-হে-হে, এহ্ হে-হে-হে-হে, অপরাধ নাই! খুন করেছে, তবু অপরাধ নাই!' এক লাফে পিছিয়ে গেল বুড়ি, তুলে নিল রাইফেলটা, 'কেউ না করুক, আমি গুলি করব।'

'বারণ করেছি? মো আ, গুলি করো!' সিকুবা আ মিনতির সুরে বলল। দাঁড়াল বুক চিতিয়ে।

'কি! গুলি করবি?' চেঁচিয়ে উঠল মিরহাম। 'রাইফেল রাখ্, মো আ। জানিস না, মাইজ চাপাহ-র জন্যে বসে আছি...'

আকাশ থেকে পড়ল রানা, 'কি বললে তুমি?'

'ঠিকই বলেছে ও।' শুদ্ধ বাংলায় বলল কেউ, 'তোমরা সবাই ভুলে গেছ আমার কথা। কিন্তু আমি তোমাদেরকে ভুলিনি, মিরহাম!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মিরহামের শরীরটা। ইশারায় মো আ-কে রাইফেল ফেলে দিতে বলল সে। বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশ মেনে নিয়ে ফেলে দিল মো আ

হাতের রাইফেল।

সিকুবা আ ছাড়া সবাই দাঁড়িয়ে আছে গুহামুখের দিকে পেছন ফিরে। গুহামুখে মাইজ চাপাহ এসে দাঁড়িয়েছে—রানা, মিরহাম, মো আ সবাই বুঝতে পারছে। কিন্তু কেউই ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল না।

'ঘেউ!' গুণ্ডার গলার আওয়াজ এল কানে। ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথার ভিতর। গুণ্ডা ফিরে এসেছে কেন?

'ডাকো ওকে।' অস্বাভাবিক শান্ত গলায় রানার উদ্দেশে বলল মিরহাম।

জিভ দিয়ে টাকরায় অস্পষ্ট শব্দ করল রানা। হুঙ্কার ছেড়ে কয়েক লাফে রানার পায়ের কাছে চলে এল গুণ্ডা।

'তুমি, ঘোড়ামুখো হারামজাদা, ফেলে দাও হাতের কুড়ুল।' আদেশ এল গুহামুখ থেকে।

নড়ল না সিকুবা আ।

উদ্বিগ্ন চোখে দেখছে রানা, সিকুবা আ প্রাণপণে চিন্তা করছে, চেষ্টা করছে সিদ্ধান্ত নিতে।

'না, সিকুবা।' নিচু গলায় বলল রানা, 'দরকার নেই।'

'ঠিক।' রানার কথা শুনতে পেয়েছে মাইজ চাপাহ। 'কুঠার তুললেই গুলি করব আমি।'

'তুমি গুলি করার আগেই তোমার বুকের ভেতর ঢুকে যাবে সিকুবার কুঠার,' বলল রানা। 'কিন্তু রক্তপাতের প্রয়োজন নেই।'

'আছে।' বলল সিকুবা আ। 'ওকে খুন করব আমি! আমার বন্ধুকে খুন করেছে ও।'

'দেখেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল মিরহাম।

'নিজ চোখে দেখেছি। ওর গুলি লেগেছে আমার বন্ধুর বুকে। আমি ওকে...'

'না।' আদেশের সুরে বলল মিরহাম। 'নোড়ো না একচুল। ফেলে দাও ওটা।'

'ব্যাটা ঘোড়া, না ঘোড়ার ডিম!' পরিহাসের সুরে বলল মাইজ চাপাহ। 'মিরহামের কাছ থেকে বুদ্ধি নে, সিকুবা। দেখছিস না আমার সামনে বর্ম রয়েছে। আমার গায়ে লাগবে তোর কুড়ুল?'

'সিকুবা!' গম্ভীর কণ্ঠস্বর রানার। 'নড়বে না তুমি। কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে, বুঝতে পারছি আমি।'

'চেয়ে দেখলেই তো পারো!' বলল মাইজ চাপাহ।

একযোগে ঘুরে দাঁড়াল রানা এবং মিরহাম।

মাইজ চাপাহ একা নয়। শিরিন কাওসারকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সে।

গড় গড় করে অনেক কথা বলে গেল অগ্নিপুত্র, মানে, মাইজ চাপাহ। দশ হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে সে। বর্ম হিসেবে ধরা রয়েছে সামনে শিরিন।

জামান আহত হয়েছে। মারা গেছে চমা মং ও কুতজোর। সে নিজে এসেছে মিরহাম ও রানার সঙ্গে কিছু জরুরী বিষয়ে সরাসরি আলাপ করতে।

শিরিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। খুলে দিল মুখে বাঁধা রুমাল। মো আ-র দিকে ফিরল। 'মো আ, এই তিনজনের খাওয়া হয়নি,' ইঙ্গিতে শিরিন, সিকুবা আ এবং মাইজ চাপাহকে দেখাল রানা। 'খাওয়ার ব্যবস্থা করো। শিরিন, তুমি মো আ-কে সাহায্য করো।'

রানার বেপরোয়া ভঙ্গি দেখে ফুঁসে উঠল মাইজ চাপাহ, 'খবরদার! বাড়াবাড়ি হচ্ছে! গুলি করব!'

'করো।' বলল রানা। শিরিনকে মো আ-র দিকে ঠেলে দিয়ে ফিরে এল মিরহামের পাশে।

'কি আশ্চর্য! এখনও আমার প্রস্তাব আমি দিতেই পারলাম না...!'

'তুমি কি প্রস্তাব দেবে জানা আছে আমাদের। বেহুদা বকর বকর না করে বসে পড়ো, আগে খেয়ে নাও চারটে।' আবার মো আ-র দিকে ফিরল রানা। ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে বলল, 'কি হলো, মো আ? এক মেয়েকে হারিয়েছ তুমি, বদলে আরেক মেয়েকে তো পেয়েই গেলে। শিরিনের সঙ্গে ঢাকায় যাবে বলেছিলে না?'

তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বুড়ি রানার দিকে। তারপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে শিরিনকে বুকের সাথে চেপে ধরল সে, চুমু খাচ্ছে গালে কপালে।

ঘুরে দাঁড়াল রানা মিরহামের দিকে, 'ছোকরা কিছু বলতে চায়, অনুমতি দাও ওকে।'

'ছোকরা? আমি ছোকরা?' মাইজ চাপাহ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, 'সাবধান! আর একবার যদি ছোকরা বলো...'

'ফালতু ফুটানি কোরো না, ছোকরা!' মিরহাম ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'কি চাও তুমি তাই বলো।'

বাইশ কি তেইশ বছর বয়স হবে মাইজ চাপাহ-র। রঙটা কালো। স্বাস্থ্যটা মোটামুটি। চেহারায় চতুর একটা ভাব।

'তোমরা পবিত্র মন্দিরে যাচ্ছ?'

মিরহাম তাকাল রানার দিকে। দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

'বলো,' বলল রানা।

'যাচ্ছি।'

'আমিও যাব।' মাইজ চাপাহ বলল।

আবার রানার দিকে তাকাল মিরহাম।

'কেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা।

'কেন? রুবির ভাগ নেব, তাই। পুলিসের চাকরি করে ক'পয়সা পাব সারা জীবনে? অনেক ভেবেচিন্তে এ পথে পা বাড়িয়েছি। আমার প্রস্তাবে তোমাদের জন্যেও নিরাপত্তা আছে। জামান সাহেব পুলিসের লোক। বিরাট এক বাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করছে সে। এই গোটা অঞ্চল আমার নখদর্পণে। তোমাদের সঙ্গে আমি থাকলে তাদের হাতে ধরা পড়বে না। আর আমি যদি না থাকি

তারা তোমাদেরকে খুঁজে বের করবেই। রুবি তো আর একটা দুটো নয়, হাজার হাজার লক্ষ কোটি টাকার, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। একটা সমান ভাগ নাহয় আমাকেও দিলে। আর সঙ্গে যদি নিতে না চাও, যদি আক্রমণ করে বসো আমাকে, তোমারও যাওয়া হবে না, মিরহাম। মরার আগে একটা গুলি আমি ঢুকিয়ে দিয়ে যাব জায়গামত।' রানার বুকের দিকে চাইল সে।

সিকুবা আ গঁ গঁ করে শব্দ করল নাক দিয়ে। রানা দেখল, কুঠারের হাতলে হাত বুলোচ্ছে সে। যে কোন মুহূর্তে করে বসতে পারে যা খুশি।

'শান্ত হও, সিকুবা আ। মনে নেই, তোমার বন্ধু আমার কথা মেনে চলতে বলে গেছে?'

ইতস্তত করতে লাগল সিকুবা আ। তারপর ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ মনে আছে। বসল ধপ্ করে, কুঠারটা রাখল সামনে।

রানা মিরহামের দিকে তাকাল, 'ছোকরাকে বলো, আমরা রাজি।'

'ছোকরাকে বলো আমরা রাজি!' ভেংচে উঠল মিরহাম। 'জানো না, একভাগ রুবির চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য আমার কাছে বেশি নয়? তবু...কি আর করব, ব্যবসা যখন মন্দা যাবে বলেই মনে হচ্ছে—যাক আমাদের সঙ্গে ও।'

'এই ছোকরার মেজাজের যা বহর, শেষ পর্যন্ত টিকলে হয়।' বলল রানা, 'আগেই খুনোখুনি...'

মিরহাম বলল, 'কার ঘাড়ে কে লাফিয়ে পড়বে, তাই নিয়ে ভাবছ তো? শোনো, বলি। তুমি যদি কোন চালাকি করতে যাও, জেনে রাখো, তোমার শিরিনকে গুলি করব আমি। মাইজ চাপাহ যদি হারামিপনা করে, ওর মাথার খুলি দু'ফাঁক করে দেবে সিকুবা আ, কারণ, মাইজ চাপাহ চয়া...ওর বন্ধুকে গুলি করে মেরেছে। আমি যদি মাইজ চাপাহর ওপর অন্যায় কিছু করি, ও গুলি করবে তোমাকে। অন্য দিকে, সিকুবা আ যদি টের পায় তোমার ওপর অন্যায় করছি আমি, আমাকে সে দেখে নেবে একহাত, কারণ, ওর বন্ধু বলে গেছে তোমার কথামত চলতে, তোমার ওপর বিশ্বাস রাখতে। এদিকে, সে যদি আমার কোন ক্ষতি করতে আসে, মো আ গুলি করবে তাকে। একমাত্র তুমি আর শিরিন থাকছ নিরস্ত্র, বাদবাকি সবার হাতেই থাকবে অস্ত্র। বুঝতে পারছ না, কী আশ্চর্য, সবকিছুই কেমন হিসেব মত মিলে যাচ্ছে খাঁজে খাঁজে?'

'হুঁ।'

মাইজ চাপাহর দিকে ফিরে মিরহাম বলল, 'রুবি নিয়ে কি করবে তুমি?'

'পালাব দেশ ছেড়ে।' মাইজ চাপাহ ঢোক গিলল দু'বার, 'আমি অন্য কোথাও বড়লোক হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।'

'তৃতীয় নয়নটা কিন্তু আমার!' চোখ পাকাল মিরহাম। 'খবরদার! ওতে হাত দিলে বেধে যাবে খুনোখুনি। ওটা আমি নেব।'

বাঁকা করে হাসল মাইজ চাপাহ। 'অমর হতে চাও, মিরহাম? আমি ওসব বিশ্বাস করি না। তুমিই নিয়ো দেবতার তৃতীয় নয়ন।'

'ঠিক আছে। এবার রওনা দিতে হবে। চারটে খেয়ে নাও তোমরা। আমাকে এক মগ চা দিস, মো আ।'

আগুনের ধারে বসে খেয়ে নিচ্ছে মাইজ চাপাহ, সিকুবা আ আর শিরিন। দুই মগ চা দিয়ে গেল মো আ রানা ও মিরহামের জন্যে দীঘির কিনারায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে আনমনে চায়ের মগে চুমুক দিচ্ছে রানা। ওর কাঁধের ওপর হাত রাখল মিরহাম।

'কে তুমি, রানা?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সে। 'তোমার থই পাই না কেন?'

'পাও না?'

'পাই না। সবই জানো তুমি, সবই বোঝো। তবু কেন চলেছ আমাদের সঙ্গে?'

'উপায় নেই, তাই।'

'উঁহুঁ। অনেক উপায় ছিল তোমার। জামানের হাত থেকে রাইফেল নিয়ে অনেক আগেই শেষ করে দিতে পারতে আমাকে। তা তুমি করোনি। তুমি দুর্বল, তা নয়। চুচ্যাং তাগলকে নিজহাতে খুন করেছ তুমি। মানুষ খুন করে অভ্যাস আছে তোমার, আমি জানি। তবু কেন চলেছ আমাদের সঙ্গে? তুমি জানো, লাল মন্দিরে পৌঁছতে পারলে তোমার বা শিরিনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে আমার কাছে। তখন নিরস্ত্র অবস্থায় তোমাদের সঙ্গে আমি কি ব্যবহার করব আমি নিজেই জানি না, তোমারও জানার কথা নয়। তবু কেন চলেছ? কিসের ভরসায়?'

'গিরিপথ যদি খুঁজে পাই, আমার অস্ত্র ফিরিয়ে না দিলে ভেতরে ঢুকব না আমি।'

'ঠিক আছে,' খানিক চিন্তা করল মিরহাম। 'তোমার অস্ত্র ফিরিয়ে দেব তোমাকে। কিন্তু তবু মেলাতে পারছি না হিসেব। মনে হচ্ছে, তোমার মাথায় কোন প্ল্যান আছে, আমি টের পাচ্ছি না সেটা। কিসের ভরসায় নিশ্চিন্তে চলেছ তুমি আমাদের সঙ্গে, রানা? আসলে কে তুমি?'

'একজন শিকারী।'

'উঁহুঁ।' মাথা নাড়ল মিরহাম। 'তোমার বন্ধু জামান সাহেব পুলিসের অফিসার, একথা আগে বলোনি কেন?'

'ভেবেছিলাম তুমি জানতে।'

রানার উত্তরে সন্তুষ্ট হলো না মিরহাম। ভ্রূ কুঁচকে বসে রইল সে অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর হাঁক ছাড়ল সিকুবা আ-র উদ্দেশে। 'গুহার বাইরে থেকে ঘুরে এসো একবার। দেখে এসো মানুষজন বা পুলিস দেখা যায় কিনা।'

একহাতে চায়ের মগ, আরেক হাতে কুঠার নিয়ে লম্বা পা ফেলে চলে গেল সিকুবা আ।

মিরহাম হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল. 'মো আ, জিনিসপত্র বাঁধো! অনেক অনেক দূর যেতে হবে আমাদের।'

মো আকে বাঁধাছাঁদার কাজে সাহায্য করছে শিরিন। পাশেই রাইফেলটা কোলের ওপর রেখে বসে আছে মাইজ চাপাহ। হঠাৎ রানা লক্ষ করল, আড়ই

হয়ে গেল শিরিনের শরীরটা। বাঁকা হয়েছিল, ঝট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কপালে ভ্রূকুটি।

মাইজ চাপাহ-এর ঠোঁটে ইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীল হাসি। হাতটা সরিয়ে নিল শিরিনের শরীর থেকে।

উঠে দাঁড়াল রানা। দ্রুত পায়ে এগোল সে মাইজ চাপাহ-র দিকে। চট্ করে রাইফেলের বাঁটে হাত চলে গেল মাইজ চাপাহর, কিন্তু রাইফেল তোলার আগেই বিদ্যুৎ বেগে পৌঁছে গেল রানা। খটাশ করে লাথি পড়ল ওর মুখের ওপর।

সুযোগের সন্ধানে ছিল মিরহাম। রিভলভারটা বের করে ফেলেছে এই ফাঁকে। মাইজ চাপাহ লাথি খেয়ে শুয়ে পড়েছিল চিৎ হয়ে, সিধে হয়ে বসল। টপ্ টপ্ করে পড়ল তার সামনের তিনটে দাঁত, সেই সঙ্গে তাজা রক্ত।

মিরহাম গুলি করতে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে তাকাবার ফুরসত নেই ছোকরার। তীব্র যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখছে সে।

'না!' ঝট্ করে তাকাল মিরহাম রানার দৃঢ়কণ্ঠ শুনে। দেখল, মাইজ চাপাহর রাইফেলটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা।

'সুযোগ পাওয়া গেছে, দিই শেষ করে।'

'আর খুন নয়।' রানা বলল, রাইফেলটা মিরহামের দিকে ধরা। 'উপযুক্ত শাস্তি হয়ে গেছে ওর।'

'রাইফেলটা সরাও, রানা।'

রানা হাসল, 'কেন?'

'সরাবে না?' এমন করে চিৎকার করল মিরহাম যে চমকে কেঁপে উঠল মাইজ চাপাহ।

রানা বলল, 'বুঝতেই পারছ। ও থাকছে আমাদের দলে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু যা ভাবছ তা নয়, রানা।' মিরহাম পকেটে ভরল রিভলভার, 'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

'যা ভাবছি তা নয়, মানে?'

'মানে ওকে তোমার জামান সাহেব পাঠায়নি। ও নিজে এসেছে। সঙ্গী দুই পুলিসকে খুন করে টাকার লোভে এসেছে—সরকারী কাজে নয়।'

'কথাটা ঠিক?' জিজ্ঞেস করল রানা মাইজ চাপাহকে।

মাথা ঝাঁকাল মাইজ চাপাহ। ঠিক।

রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল রানা ওর দিকে, 'নাও। আর কোন রকম বেয়াদবি করলে হাড় গুঁড়ো করে দেব।'

রাইফেলটা লুফে নিল মাইজ চাপাহ। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে সে। ঘুরে দাঁড়াল রানা। ওর পেছনে আরও এক জোড়া বিস্মিত চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মিরহামের। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না সে রানাকে।

শিরিনকে নিয়ে একপাশে সরে গেল রানা।

জানতে হবে, সত্যিই পুলিস দু'জন খুন হয়েছে কিনা।

সিকুবা আ ফিরে এসে জানাল, কোথাও চিহ্ন নেই পুলিসের। রওনা হয়ে গেল ওরা।

সকলের আগে মিরহামের ঘোড়া। তার পেছনে মাইক চাপাহ। তারপর মো আ, তার হাতের রাইফেল মাইক চাপাহর শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে তাক করা। তারপর শিরিন। শিরিনের পেছনে রানা। ওর পাশে সিকুবা আ।

বিড়বিড় করে বলছে সে, 'বন্ধু কি যে বললে তুমি! না মনে আনতে পারি। কথাটা যে এই কুকুরের দলের সম্পর্কে, জানি। সেই জন্যেই আমরা দু'জন এসেছিলাম বুড়ি আফা আর মো আ-র কাছে। কিন্তু এমনই বোকা আমি, খেয়ে ফেলেছি। কথাটা হজম হয়ে বেরিয়ে গেছে পায়খানার রাস্তা দিয়ে, না আছে পেটের ভিতর।'

'মনে পড়বে।' আশ্বাস দিল রানা, 'চেষ্টা করতে থাকো।'

কথাটা সিকুবার মনে পড়লে কি ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হবে জানলে অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যেত রানার। ঘোড়ামুখো এই বিকট দৈত্য যে ওর কথায় উঠছে বসছে তাতেই আনন্দে আটখানা হয়ে আছে সে।

চলছে তো চলছেই। সন্ধ্যার পরও থামল না ওরা। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অবিশ্রাম ছুটছে ঘোড়াগুলো। ক্লান্ত সবাই। কথা বলবারও উৎসাহ বা ধৈর্য নেই। মধ্যরাতে নির্দেশ দিল মিরহাম, 'আর নয় আজ।'

খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

পরদিন সকালে মো আ-র উল্লাস ধ্বনিতে ঘুম ভাঙল রানার।

'দুই মিনার! দুই মিনার! ওই দেখা যায় দুই মিনার!' ধেই ধেই করে নাচছে বুড়ি।

হাসছে মিরহাম। রানার পাঁজরে খোঁচা মারল সে, 'আর মাত্র চল্লিশ মাইল, তারপর তিন দিনের পথ—হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল রানা। একে একে দেখল সবাইকে। সবাই, এমনকি শিরিনও উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়েছে।

রানার ভয় হলো, এখনই এমন, মন্দিরে পৌঁছে এরা কি করবে?

নয়

অনিকদাম থেকে মর্গানের দলকে বাইশ দিনের দিন নিয়ে গিয়েছিল হংগ দুই মিনারের নিচে। ওদের লাগল চারদিন। ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠছে পথ।

রাতের বেলা বিশ্রাম, দিনের বেলা দুর্গম চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে একটু একটু করে এগোনো। এই ক'দিন উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ঘটনা ঘটল না। শুধু একটি ব্যাপারে উত্তরোত্তর উদ্বেগ বাড়তে লাগল রানার—মিরহাম কথা বলছে কম।

পরদিন দুপুর বেলা পাওয়া গেল সেই লালচে নুড়ি বিছানো বিস্তীর্ণ এলাকা।

দাঁড়িয়ে পড়ল দলটা। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল মিরহাম। রানার কাছে এসে দাঁড়াল সে, 'তুমি ভুল পথে এনেছ, রানা। জানতে চাই, ইচ্ছা করে কিনা।'

গত দুই দিনে এই প্রথম কথা বলল মিরহাম।

'কোন ভুল হয়নি,' রানা বলল।

'ভুল হয়নি তো মার্মা গ্রাম কোথায়?' মিরহাম বলল, 'হংগ মর্গানদেরকে এই লাল নুড়ি পাথরের তেপান্তরে নিয়ে আসার আগে…'

'জানি,' বলল রানা। 'আমরা পেছনে ফেলে এসেছি সেটা।'

'দেখেছ তুমি?'

'না। অনুমান করে বলছি।' রানা বলল, 'না দেখলেও চলে।'

'চলে না।' মিরহাম রুল জারি করল, 'ফিরে যাব আমরা। মার্মা গ্রাম দেখব আগে।'

বিরক্ত হয়ে উঠল রানা, 'হংগ অনর্থক ঘুরিয়েছিল মর্গানদের। আমাদেরও তাই করতে হবে? লাল পাহাড়ের রাস্তা তুমি জানো, না আমি জানি? এক পা-ও পিছু হটা চলবে না।'

'তোমার হুকুম?' গোঁয়ারের মত প্রশ্ন করল মিরহাম।

'যদি মনে করো, তাই।' সিদ্ধান্তে অটল রানা।

রানার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মিরহাম লালচে নুড়ি চারদিকে ছড়িয়ে, ফিরে গেল নিজের ঘোড়ার কাছে, লাফ দিয়ে চড়ে বসল। পা দিয়ে ঘোড়ার পাঁজরে খোঁচা মারতেই ছুটল ঘোড়া।

গোটা দলটা এগিয়ে চলল।

গভীর রাত পর্যন্ত আর কোন ঘটনা ঘটল না। সন্ধ্যার পর মাঠের মাঝখানে থেমে খাওয়াদাওয়া, খানিক বিশ্রাম, তারপর আবার ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া।

কথাবার্তা থেমে গেছে। সিকুবা আ শুধু ভুরু কুঁচকে বিড় বিড় করছে থেকে থেকে, 'আহ্! কেন না মনে পড়ে!'

পাহাড় দেখা গেল। কোন একটাকে নির্দিষ্টভাবে চেনা অসম্ভব। একটার সাথে আর একটা, গায়ে গা ঠেকিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পর আবার চড়াই।

চাঁদ যখন ডুবু ডুবু, ক্লান্ত দলটা থামল।

খেয়েদেয়ে চুরুট ধরাল মিরহাম। রানা সারাক্ষণ নজর রেখেছে তার ওপর। ডাকু-সর্দারের ভাবগতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না তার।

'এখনও সময় আছে।' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল মিরহাম।

ওরই উদ্দেশে বলা হয়েছে কথাটা বুঝেও চুপ করে রইল রানা। সন্দেহ জেগেছে মিরহামের মনে। ওর ধারণা হয়েছে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে রানা। তর্ক করে এই সন্দেহ দূর করা যাবে না।

কোন কাজ করেনি দলে যোগ দেবার পর থেকেই, খেয়েদেয়ে পাথরের ওপর মাথা দিয়ে একটু দূরে শুয়ে আছে মাইজ্ঞ চাপাহ, রাইফেলটা পাশে। বলল, 'আমিও তাই বলি।'

রানা এরপরও কথা বলল না দেখে মিরহাম সরাসরি বলল, 'ভুল যদি না করে থাকো, ভাল কথা। কিন্তু সকালে উঠে সেই সরু পথটা যদি না পাই, তোমার, তোমার, থাদুন্নুয়াঙের কিরা কেটে বলছি, রানা…'

'একটা চুরুট দাও তো, মো আ?' হাত বাড়াল রানা।

মোটা একটা চুরুট রাখল মো আ রানার হাতের ওপর। ধরিয়ে নিল সেটা রানা।

'আমাকে একটা চুরুট দাও।' রানার দেখাদেখি হাত বাড়াল মাইজ্ঞ চাপাহ মো আ-র দিকে।

থোক্ করে এক গাদা থুথু ফেলল মো আ ওর বাড়ানো হাতের তালুতে।

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মাইজ্ঞ চাপাহ। সেই সঙ্গে রানাও। রানা ঝাঁপিয়ে পড়ল মো আ-র উপর।

কান ফাটানো শব্দ হলো গুলির। মো আ-র মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল মাইজ্ঞ চাপাহ। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

মো আ-কে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল রানা পাথরের ওপর। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে মাইজ্ঞ চাপাহ, বোল্ট টেনে আরেকটা গুলি ভরল চেম্বারে।

'দু'জনকেই খুন করব।'

পেছন থেকে একটা হাত খপ করে ধরল মাইজ্ঞ চাপাহর ঝাঁকড়া চুলের মুঠি। পরমুহূর্তে তুলে ফেলল ওকে শূন্যে। প্রকাণ্ড দানবের হাতে অসহায় ছাগলছানার মত হাত-পা ছুঁড়ছে মাইজ্ঞ চাপাহ। সিকুবা আ-র ডান হাতে ধরা কুঠারটা কাৎ হয়ে সরে গেল এক পাশে, এক কোপে আলাদা করে দেবে মাথাটা ধড় থেকে।

'না না!' আধশোয়া অবস্থায় চিৎকার করে উঠল রানা, 'সিকুবা আ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওকে।'

ঘোড়ার মত মুখটা নির্ভাজ হয়ে গেল সিকুবার। জল হয়ে গেছে রাগ রানার কথা শুনে। নামিয়ে দিল সে মাইজ্ঞ চাপাহকে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাইজ্ঞ চাপাহ।

'খুন…খুনের কথাই বলেছিল বন্ধু আমাকে।' সিকুবা আ এপাশ ওপাশ মাথা দুলিয়ে স্মরণ করবার চেষ্টা করছে, 'এইটুকু মনে পড়ছে। কিন্তু কথাটা কি, মনে না আসছে। খুন-টুন না করতে বলেছিল হয়তো।'

'তাই-ই।' বলল রানা, 'চেষ্টা করো, মনে পড়বে। আমরা সবাই একই দলে, সিকুবা। মিরহাম আমাদের নেতা। সবার উদ্দেশ্য এক, কেউ কারও ক্ষতি করব না, কেমন?'

সিকুবা আ ভাবছে।

'ঠিক।' মিরহাম বলল, 'এটাই আমাদের শেষ ঘাঁটি। এরপর, কাল সকালে

সরু পথ পেরিয়ে, খুঁজে বের করতে হবে শুধু গোপন গুহাটা। তারপর…'

'পবিত্র মন্দির!' বলল মো আ।

'রুবি মন্দির!' বলল শিরিন অস্ফুট কণ্ঠে।

'আচ্ছা, আজ রাতেই সরু পথটা খুঁজে বের করে ফেললে ক্ষতি কি?' মিরহাম বলল।

সিকুবা আ বলল, 'না।'

'না? কেন?'

'বন্ধুর নিষেধ। না যাব রাতে।'

কেউ লক্ষ করেনি, মাটি থেকে উঠে মো আ রানার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সে পেছন থেকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রানাকে, সেই সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মো আ-র দুই হাত ধরে ফেলে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল রানা, 'কি হলো? কাঁদছ কেন? কি হয়েছে, মো আ?'

মো আ কাঁদছে তো কাঁদছেই, ছাড়ছেও না রানাকে। রুদ্ধস্বরে এক সময় বলল, 'তুই-ই আমার পেটের ছেলে, রানা। ওই মিরহাম, ও আমার কেউ না। চোখের সামনে মারছে দেখেও কিছু করল না। বাঘে নিয়ে গেল, কিছু বলল না; এই হারামির বাচ্চা রাইফেল তুলল, গুলি করল—নড়ল না জায়গা থেকে! ওকে পেটে ধরিনি আমি…'.

অন্যদিকে চেয়ে বসে রইল মিরহাম। এক মনে ফুঁকছে চুরুট। কোথাও প্রায় খাড়া উঠে গেছে পাথরের গুঁড়ো বিছানো পথ, কোথাও খাড়া ভাবে নেমে গেছে নিচে। এই অদ্ভুত রহস্যময় পথটা কত লম্বা, অনুমান করা দুঃসাধ্য।

মাথার ওপর আকাশ কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না। দু'পাশে পাহাড়ের গা প্রায় মসৃণ হলেও এটা যে কৃত্রিম পথ নয়, বোঝা যায় বেমক্কা চড়াই উৎরাই আর প্রশস্ততার কমবেশি দেখে। মানুষের হাতে তৈরি হলে, প্রস্থ মোটামুটি সমান হত, সমতল হত। পাহাড় কেটে এই রকম একটা রাস্তা তৈরি করা, এক কথায় অসম্ভব। এ যুগেও। চল্লিশ-পঞ্চাশ, কোথাও একশো দুশো মানুষ উঁচু পাহাড়ের গা। কোথাও আবার দৃষ্টি পৌঁছোয় না, অনেক উঁচু এবং পিঠ বাঁকা বলে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠল ঘোড়াগুলো। মো আ প্রস্তাব দিল বিশ্রাম নেবার। ঘোড়ার কষ্ট সহ্য হচ্ছে না তার।

গুণ্ডার কিছু একটা হয়েছে। ঘেউ ঘেউ করছে, বার বার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে রানার ঘোড়ার সামনে, কিছু যেন বলতে চাইছে সে। খুবই অস্বাভাবিক। বিপদের গন্ধ না পেলে এমন কখনও করে না গুণ্ডা। অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছে রানা, গুণ্ডা ভয় পেয়েছে। অথচ বিপদ যে ধরনেরই হোক, ভয় পাবার মত জানোয়ার নয় সে। ঘোড়াগুলোও হঠাৎ কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে দিয়েছে।

আশ্চর্য মৌনতা বজায় রাখছে সবাই। সতর্ক সন্দিহান সবার চোখের দৃষ্টি। আড়চোখে এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে। বিশ্বাস নেই কারও ওপর কারও।

আধঘন্টা কাটল। আবার ঘোড়ায় চড়ল ওরা। কেউ টু শব্দটিও করেনি এই আধ ঘন্টায়।

চড়াইয়ের পর উৎরাই। নামতে নামতে সমতল পথটা দেখতে পেল ওরা সামনে। বহুদূর চলে গেছে। তারপর বাঁক।

পিছিয়ে পড়েছিল রানা। গুগাকে নিয়ে বিপদ হয়েছে ওর। পথ আগলাচ্ছে, নিষেধ করছে সামনে বাড়তে।

ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে দলটা।

'কি হলো?' শিরিন ফিরে আসছে, চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সে।

'বুঝতে পারছি না।'

দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিরহাম, রাইফেলটা ওদের দিকে তাক করে ধরা।

'গুলি করি। লাশটা রেখে চলে এসো।' চিৎকার করে উঠল মিরহাম। ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তার কথাটা।

'গুগা, থাম!'

শান্ত হলো বটে গুগা; কিন্তু মুষড়ে পড়া, বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল সে, পথও ছাড়ল না।

'সরে যা।'

সরে গেল গুগা। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রানা।

মিরহামের সঙ্গে বাঁক নিল ওরা। দেখল, অগ্রবর্তী দলটা পঞ্চাশ গজ সামনে চারদিকের পাথরের মতই মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। কথা নেই, শব্দ নেই—প্রাণ নেই যেন কারও মধ্যে।

জায়গাটা প্রশস্ত। ঘোড়া থেকে নেমে উন্মাদের মত ছুটোছুটি করে ডজন খানেক সরু পথের মুখের সামনে গিয়ে পাঁচ সেকেন্ড করে দাঁড়ান মিরহাম। সব শেষেরটা দেখে ফিরে এল রানার সামনে।

'এসবের মানে?'

উত্তর না দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল রানা। ঘাবড়ে গেছে ও নিজেও।

ঘর্মাক্ত মিরহাম পিছু নিল রানার। নড়ল না আর কেউ।

একে একে বারোটা সরু পথের মুখ দেখল রানা। বেকুব বনে গেছে ও।

'ভুল পথে এনেছ, রানা? স্বীকার করো এখনও!' বজ্র কঠিন কণ্ঠে বলল মিরহাম।

'সরু পথের শেষে গোপন দরজা, মর্গান তাই বলেছিল, তাই না?' রানা বলল। 'রড়ি আঁফার নকশাতেও তাই দেখানো হয়েছে। মানে, নকশাটা সরু পথ দেখাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। বালির ওপর, অন্য এক জায়গায় এগারোটা গুহামুখ এঁকে, নির্দিষ্ট গুহামুখটা আমাকে দেখিয়েছিল রড়ি আঁফা। সরু পথের শেষে বা মাঝখানে কোথাও এরকম জায়গার কথা আমাকে বলেনি সে।'

'বলেনি? তবে কেত্থেকে এল এই জায়গা?'

প্রশস্ত জায়গাটায় এসে মিলিত হয়েছে বারোটা পথ। এঁকে বেঁকে দূরে হারিয়ে গেছে, শেষ কোথায় জানবার উপায় নেই।

কথা বলল মো আ, 'ঠিকই আছে, মিরহাম।'

'ঠিক আছে? কি বলছিস?'

মো আ বলল, 'রড়ি রানাকে বলেনি।'

'তুই জানলি কিভাবে?'

'একটা রহস্য গোপন রাখবে রড়ি আঁফা, আমি জানি। বাইরের লোককে সব রহস্য জানালে মহাপাতক হত সে।'

'এইখানে এসে বুদ্ধি খাটাতে বলেছিল আমাকে রড়ি আঁফা,' বলল রানা।

'তাহলে খাটাও বুদ্ধি!' হুকুম করল মিরহাম।

মাইজ চাপাহ বলল, 'বারোটা পথ ধরে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে দেখে আসা যায়।'

'গাধার বাচ্চা, চুপ থাক!' গর্জে উঠল মিরহাম, 'তোর মাথায় আছেটা কি? তুই কি বলছিস, রানা?' দাঁত মুখ খিচিয়ে প্রশ্ন করল সে।

আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। মন্দিরের যত কাছে আসছে মিরহাম, ততই বেপরোয়া হয়ে উঠছে উন্মাদের মত। সবাইকে তুই-তোকারি করতে শুরু করেছে। কিন্তু এ নিয়ে এখন কিছু বলতে গেলে ফল কি হবে বুঝতে পেরে গ্রাহ্য করল না ব্যাপারটা। বলল, 'যে পথটা দিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছি, সেটায় মুখোমুখি কোন পথ আছে?'

আছে জানে, রানা। তবু, মিরহামকে কাজে ব্যস্ত করে তোলার জন্যে প্রশ্নটা করল।

ছুটে চলে গেল মিরহাম। এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল, 'ওই যে, ওইটা।'

'ওটা ধরেই এগোই চলো।'

'এ-পথের শেষে গোপন দরজা আছে?'

'তা আমি কি করে বলব?'

'বলতে না পারলে সঙ্গে এনেছি কেন তোকে?'

রানা বলল, 'মিরহাম, বাড়াবাড়ি করছ তুমি।'

'তো কি? খুন করবি আমাকে?' বুক টান করে দাঁড়াল মিরহাম।

'কে বলেছে তুমি আমাকে নিয়ে এসেছ? আমি না এলে পারতে তুমি আমাকে আনতে? এখনও সাধ্য আছে, যদি আমি রাজি না হই, আর এক পা-ও সামনে বাড়াতে?'

চট করে সামলে নিল মিরহাম। হাসল সবিনয়ে।

'কী আশ্চর্য! রাগ করো কেন, রাগ করো কেন? আমি কি তাই বলেছি? তুমি দেখছি, দোস্তো, ঠাট্টাও বোঝো না! চলো, চলো, এমনিতেই অনেক সময় বয়ে গেল। দোস্তো, তোমার আমার মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল না? তুমি আমার দোস্তো, আমি তোমার দোস্তো, না?'

বিপদ সঙ্কেত অনুভব করল রানা মনের ভিতর। বুঝতে পারল, আরও অনেক সাবধান হতে হবে ওকে। ক্রমে আসল চেহারা প্রকট হয়ে উঠছে মিরহামের।

দশ

আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে সবারই। স্থির থাকতে পারছে না কেউ। কাজ হাসিল হয়ে গেলেই খুন করবে মিরহাম যাকে ইচ্ছা তাকে। কোন সুযোগই হাত ছাড়া করবে না মাইজ চাপাহ। একমাত্র ব্যতিক্রম সিকুবা সা, গুপ্তধনের প্রতি এখন পর্যন্ত কোনরকম লোভ প্রকাশ পায়নি তার। কিন্তু সবার চেয়ে বেশি উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যেই। প্রতি মুহূর্তে ক্রোধ বাড়ছে তার নিজের ওপর চম্রা মং কি বলে গেছে মনে করতে পারছে না বলে। মো সা কথা যখন বলে, বলে। এমনিতে চুপচাপ কাজ করতেই ভালবাসে সে। কিন্তু চোখ মুখ ফোলা ফোলা হয়ে উঠেছে তারও! সারাক্ষণ বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ার মত কি যেন বলছে। চাপা কণ্ঠস্বর, কাঁপা কাঁপা।

শিরিনও চঞ্চল।

আর গুণ্ডা, কিছুদূর পর পর আবার সে পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে রানার। বিকট স্বরে চিৎকার করছে—না, যেতে দেবে না।

ঘোড়াগুলোও কেন যেন অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করেছে আবার। ভীত, সন্ত্রস্ত, বিস্ফারিত চোখ।

এগোবার নেশায় অনেক দূরে চলে গেছে দলটা। সকাল থেকেই রানার কাছে কাছে রয়েছে শিরিন।

'যেতে নিষেধ করছে ও,' রানা বলল। 'কিন্তু কারণটা কি?'

মিরহাম দাঁড়িয়ে পড়েছে দূরে। রাইফেলটা ধরে আছে, আগের মতই।

গুণ্ডার চিৎকারে কান পাতা দায়।

'এই রকম ভূতুড়ে পরিবেশ দেখে মনে হয় ভয় পেয়েছে ও,' শিরিন বলল। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে রানা, চলো।' ব্যস্ত হয়ে উঠল শিরিন।

'না,' চিন্তিত রানা বলল, 'অকারণে ভয় পায়নি ও। কিছু একটা টের পাচ্ছে জানোয়ারগুলো—আমরা পাচ্ছি না। সামনে বিপদ।'

'বিপদ?'

রানা উত্তর দিল না। চিৎকার করে উঠল ও মিরহামের উদ্দেশে।

'খবরদার! খুন করে ফেলব তোমাকে!'

গুণ্ডাকে গুলি করার জন্যে দূর থেকে লক্ষ্যস্থির করছে মিরহাম। অন্য সময় হলে, রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে মিরহামের দিকে তাকাত গুণ্ডা। কিন্তু রানার চিৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করে কান ফাটানো শব্দে চিৎকার জুড়ে দিল—ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ—একটানা, অবিরাম।

হঠাৎ নড়ে উঠল মিরহাম, দুলে উঠল দু'পাশে পাহাড়ের দেয়াল। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে যেতে রানা দেখল মাথার ওপর থেকে মস্ত বড় বড় পাথরের হাজার হাজার টুকরো নেমে আসছে নিচের দিকে, সরু পথের ওপর।

ভূমিকম্প!

রানার মনে হলো দু'পাশের পাহাড় দু'দিক থেকে সরে এসে চেপে ধরবে এখুনি। উপর থেকে কয়েক হাজার ছোট বড় পাথর নামছে। ছোট একখানা এসে ওর মাথায় পড়তেই অন্ধকার হয়ে গেল দুনিয়াটা।

'বেঁচে আছি?' জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলল রানা, শিরিনের কোল থেকে মাথা তুলে উঠে বসল, 'রাখে আল্লা মারে কে! একি, শিরিন তুমি কাঁদছ? ওরা সবাই কোথায়...?'

'কেউ বেঁচে নেই।' শিরিন তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে।

শিরিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। সামনের পথটা নেই। ওদের হাত পঁচিশেক দূরে পাথরের টুকরোর পাহাড় জমে উঠেছে। ভরাট হয়ে গেছে সম্পূর্ণ। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, টুকরো পাথরের স্তূপ যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্যন্ত, দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করেছে একটা।

ঝট্ করে পেছন দিকে তাকাল রানা।

'পেছনে পথ...?'

'জানি না। পাথর পড়ার শব্দ এইমাত্র থামল।

রানা মাথা স্থির রাখার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। পায়ে মাথা ঘষছিল ওওা, হাত বুলিয়ে দিল তার মাথায়, 'বুঝতে পেরেছিলি, নারে?' ওপর দিকে তাকাল রানা; আকাশ দেখা যাচ্ছে না, 'সরাসরি আমাদের মাথায় পাথর পড়েনি ভাগ্যিস! নেহায়েত কপালগুণে বেঁচে গেছি আজ!'

'বাঁচলে কোথায়?' শিরিন রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরার চাইতে পাথর চাপা পড়ে মরা কি ভাল ছিল না?'

বিড়বিড় করে বলল রানা, 'নাহ্, লাভ নেই। দেখতেই পাবে না আমাদের।'

'কি বলছ?'

'কিছু না।' রানা বলল, 'ওঠো, দেখা যাক কতদূর পিছিয়ে যাওয়া যায়। এমন ভেঙে পড়ছ কেন, পেছনের পথটা খোলাও তো থাকতে পারে।'

'না, পারে না।' শিরিন এতটুকু আশান্বিত হলো না, 'পাথর পড়ার শব্দ যদি শুনতে, বুঝতে তাহলে।'

'আমার হয়েছিল কি?'

'মাথায় ওই পাথরটা ছিট্‌কে এসে লেগেছিল, ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার পরপরই।'

পাথরটা দেখল রানা। তুলে নিয়ে চুমু খেল। পরিবেশটা হালকা করবার জন্যে মৃদু হেসে বলল, 'একটু আদর করে দিলাম। মাথার সাথে ঠোকর খেয়ে ব্যথা পেয়েছে বেচারি।'

কাজ হলো না।

'রানা!' উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকের ওপর শিরিন। 'কি হবে

এখন?'

এপথে এ জীবন এসেছে, বিশ্বাস হয় না। ঘোড়া দুটোর রাশ ধরে পায়ে হেঁটে এক গজ এক গজ করে এগুচ্ছে ওরা। পাথরের টুকরো কোথাও ঢিবি মত, কোথাও প্রাচীর মত। একটার পর একটা ব্যারিকেড, একটার পর একটা ডিঙিয়ে যাচ্ছে ওরা। পড়ে যাচ্ছে পা পিছলে, উঠছে আবার।

সেই প্রশস্ত জায়গাটায় পৌছুতে আড়াই ঘন্টার ওপর লাগল ওদের। ক্লান্ত দেহ লুটিয়ে দিল শিরিন পাথুরে মেঝেতে। তার পাশে বসে পড়ল রানাও।

দশ মিনিট নিঃশব্দে চোখ বুজে রইল শিরিন।

হঠাৎ চোখ মেলেই চিৎকার করে উঠল, 'রানা।

'দেখেছি,' বলল রানা। শিরিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে আবার দেখল সে গিরিপথটা। হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

এইখানেই একটা কথা গোপন করেছিল রানার কাছে রড়ি আঁফা। তেরোটা গিরিপথের কথা বলেছিল, ওরা এসে পেল বারোটা। একটার সঙ্গে আর একটার দূরত্ব বিশ পঁচিশ গজ। অতগুলো মানুষ কারও চোখে পড়েনি ত্রয়োদশ গুহামুখটা।

'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ?'

অস্ফুটে বলল শিরিন, 'পেরেছি।' একবার গিরিপথটাকে, একবার পথের সামনে পড়ে থাকা পাথরের ঢাকনিটাকে দেখছে সে।

দু'জন ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি ঢুকে যেতে পারে এই পথে। খাপে খাপে বসেছিল পাথরের ঢাকনিটা। সেটা এখন পড়ে রয়েছে গিরিপথের সামনে, চার টুকরো হয়ে গেছে ভেঙে।

'ভূমিকম্পের ফলে খুলে পড়ে গেছে।' শিরিন বলল, 'আমার মনে হয়, ওর ভেতর দিয়ে গেলেই মন্দিরে যাওয়ার গুহা পাওয়া যাবে।'

'চুপ!' কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে রানা।

'ও কিসের শব্দ?' রানার গা ঘেঁষে সরে এল শিরিন, 'আমার ভয় করছে।'

'মনে হলো, ড্রাম বাজছে। একসঙ্গে অনেকগুলো।'

'কারা ওরা?' শিরিন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কি বাজাচ্ছে অমন করে?'

'বাজাচ্ছে না।' রানা বলল, 'ঘোড়ার পায়ের শব্দ ওটা।'

'কারা আসছে?' শিরিন ঢোক গিলল, 'তবে কি মার্মাদের দল আসছে আমাদেরকে...'

শিউরে উঠল সে। থেমে গেল রানার ইঙ্গিতে।

কয়েক সেকেন্ড কান খাড়া করে শুনল রানা, তারপর বলল, 'কোন ভয় নেই। মিরহামের দল।'

'ওরা ফিরে আসছে কি করে? ওরা না আমাদের সামনে ছিল? পাথর পড়ে তো রাস্তাটা...'

'বন্ধ হয়ে গেছে ঠিকই, ওরা গুহাপথ ধরে আরও সামনে এগিয়েছে,

গোলক ধাঁধায় ঘুরে আবার ফিরে আসছে অন্য পথ দিয়ে আগের জায়গায়। ভয় নেই, ভূত-প্রেত কিচ্ছু না, জ্যান্ত মানুষেরই দেখা পাবে আর খানিক বাদে।'

'ভয় নেই বলছ কেন? জ্যান্ত হলে তো আরও ভয়ের কথা। এসো, লুকিয়ে পড়ি কোথাও।'

'লুকোতে যাবে কেন, শিরিন? লুকোবার জন্যে তো আসিনি আমরা এতদূর।'

'বুঝতে পারছ না...মিরহামকে একবিন্দু বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। মন্দিরে পৌঁছে রুবি পেয়ে গেলেই তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ওর কাছে। একটুও দ্বিধা করবে না ও আমাদের খুন করতে।'

'জানি।' বলল রানা। 'তোমাকে খুন না-ও করতে পারে। সুন্দরী মেয়েদের চট্ করে খুন করতে চায় না দস্যুরা। তবে আমাকে যে প্রথম সুযোগেই শেষ করতে চাইবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।'

'তাহলে? তবু কেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছ ওকে? তুমি জানো না, আমার নিরাপত্তার থোড়াই কেয়ার করে ও—আমাকে পুলিস ক্যাম্পে পাঠাবার ছল করে আসলে ফাঁদ পেতেছিল মাইজ চাপাহকে টেনে আনবার? ও জানত, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে মাইজ চাপাহ। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করছে আসলে মিরহাম।'

'সব জানি আমি, শিরিন। এই মুহূর্তে ও যেমন নাচাচ্ছে তেমনি না নেচে উপায় নেই আমার। কিন্তু সময় এলেই দেখতে পাবে, এত ছলনা বা অভিনয় করে শেষ পর্যন্ত ঘোল খেয়ে যাবে নিজেই।'

'কেমন করে?'

'সেটা কি ছাই আমি নিজেই জানি? তবে মিরহামের হাতে যে আমার মৃত্যু হবে না, এটা আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি। এই একটি ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি।'

মিরহামকে দেখা গেল সরু একটা পথের বাঁকে। রানাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'দোস্তো!'

'দোস্তো! দোস্তো! দোস্তো! দোস্তো!'

ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারদিক থেকে শব্দটা।

'দোস্তো, কাজের কথায় আসা যাক।' কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল মিরহাম।

মাইজ চাপাহ বলল, 'হ্যাঁ, কাজের কথা শুনতে চাই আমরা। গোপন দরজা খুঁজে বের করতে পারবে কিনা, এক কথায় উত্তর দাও।'

'না। আমার প্রশ্নটা অন্যরকম।' মিরহাম বলল, 'পারাপারির প্রশ্ন নয়। আমি জানতে চাই, গোপন দরজা আমাদেরকে দেখাবে কি না দেখাবে, রানা?'

'দেখাব, যদি আমার পিস্তলটা ফেরত দাও।'

'দেখাও আগে, দিচ্ছি ফেরত।' বলল মিরহাম।

'ওই যে, দ্যাখো।' আঙুল তুলে দেয়ালের গায়ের গোলাকার গর্তটা দেখিয়ে দিল রানা।

কয়েক মুহূর্ত বাক্‌স্ফূর্তি হলো না কারও মুখে। তারপর গোটা দলটা ছুটল সেই দিকে।

পেছনে রইল রানা, শিরিন এবং সিকুবা আ।

'কথাটা মনে না আসছে!'

'এখনও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'না ঘামাব মাথা?'

'কি দরকার?' বলল রানা। 'ভুলে যাও। ভুলে যাবার চেষ্টা করো। হয়তো ভুলে থাকবার চেষ্টা করলেই মনে পড়ে যাবে।'

'তবে তাই করি।'

'রানা কোথায়?' হাঁক ছাড়ল মিরহাম।

পা বাড়াল রানা। গর্তের সামনে, মিরহামের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। হাত বাড়াল সামনে। 'কই, ফেরত দাও আমার অস্ত্র।'

'দিচ্ছি। দেব বলেছি যখন, ঠিকই দেব। দোস্তো, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না কেন? অস্ত্র নেবার আগে বলো দেখি এই পথের শেষে কি আছে?'

'জানি না,' রানা বলল। 'ঢোকো, দেখা যাক কি আছে।'

'তোমরা দেখোনি?'

'না।'

'মিথ্যে কথা!' বলে অধৈর্য মিরহাম চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। 'দেখি কোথায় এর শেষ। মাইজ, রানার পিছনে থাকবি তুই, একটু এদিক ওদিক করলেই দিবি সাবাড় করে, আমার অনুমতি নেবার দরকার নেই।'

প্রশস্ত একটা সুড়ঙ্গের মত জায়গাটা। আধ মাইল মত লম্বা। সবশেষে বাঁক। বাঁক নিতেই দেখা গেল ফুটবল মাঠের মত বিশাল একটা সমতল ভূমি। লম্বায় কয়েকশো গজ, প্রস্থে শ-দেড়েক গজ। মাঠের ওপারে পাহাড়ের গায়ে দশ বারো হাত পর পর একটি করে গুহা, প্রত্যেক গুহার মুখে একটা করে পাথর বসানো।

ঘোড়া থেকে পাথরের মেঝেতে পড়ল মিরহাম চিৎ হয়ে। স্বইচ্ছায়। ডিগবাজি খেল চার পাঁচবার, তারপর তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। দু'হাত মাথার ওপর তুলে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে ছুটে এল সে রানার ঘোড়ার দিকে। 'কি করব! এখন আমি কি করব! কি না করব! কি করব! কি না করব! কি...' রানাকে দু'হাত দিয়ে ধরে নামিয়ে ফেলল ঘোড়ার পিঠ থেকে। তারপর লাফাতে লাফাতে গিয়ে দাঁড়াল মাইজ চাপাহর সামনে। এইমাত্র নেমেছে মাইজ চাপাহ। দড়াম করে ঘুসি মারল মিরহাম ওর চোয়ালে।

ছিটকে পড়ে গেল মাইজ চাপাহ।

'ভাই আমার!' চিৎকার করে ডাইভ দিয়ে পড়ল মিরহাম মাইজ চাপাহর বুকের উপর, 'রাগ না করতে পারবে। আনন্দের পুকুরে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি।' বলেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। তড়াক তড়াক লাফাচ্ছে ছাগলের বাচ্চার

মত। আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছে না।

মো আ প্রাণপণে, ছন্দোবদ্ধভাবে, তালি মারছে। চোখ দুটো বোজা তার, মন্ত্র পড়ছে সুর করে।

সিকুবা আ উন্মাদের মত টানছে নিজের মাথার চুল, বিড় বিড় করছে, 'মনে না আসে কেন…'

ওদের দিকে মনোযোগ নেই রানার। গুহামুখ গুনছে ও। ঠিকই আছে। মোট এগারোটা।

'কত নম্বর?' দশ হাত দূর থেকে লাফ দিয়ে রানার সামনে এসে পড়ল মিরহাম।

'ছয় নম্বর, এবার ফেরত দেবে পিস্তলটা?'

'না। ওটার মুখে পাথর নেই কেন?' আঙুল দিয়ে তিন নম্বর গুহামুখটা দেখাল মিরহাম।

'মনে হয় ওটাতেই লুকিয়েছিল মর্গান প্রাণের ভয়ে।'

'আমার ভয়ে তোকেও হয়তো ওইখানেই লুকোতে হবে।' বলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মিরহাম। হঠাৎ থামল সে, 'ধুস্ শালা মিরহাম! হাসির আর সময় পেলি না? রানা, এই শালা, পাথর নামা।'

চটাৎ করে চড় কষাল রানা মিরহামের গালে।

টলে উঠল মিরহাম, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। হাত বুলাল গালে। 'আমার মত পাগল হয়ে গেছিস তুইও, রানা।' হিংস্র চোখে রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আনন্দে। তুই ভয়ে।' ঘুরে দাঁড়াল সে।

ছয় নম্বর গুহামুখ থেকে পাথর দুটো টেনে হিঁচড়ে সরাতে চেষ্টা করল মিরহাম, পারল না। হাত লাগাল মাইজ চাপাহ, তবু নড়ল না পাথর। রানাও ঠেলল ওদের সাথে, কিন্তু যেমন ছিল তেমনি অটল রইল সেটা। এইবার এগিয়ে গেল সিকুবা আ। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল পাথরটাকে। কয়েক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না, বিশাল বাহুর পেশীগুলো ফুলে উঠল—থর থর করে কাঁপছে। তারপর এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি করে শূন্যে উঠে গেল আস্ত পাথরটা। দুই ফুট উঁচু করে একপাশে গড়িয়ে ফেলে দিল ওটাকে।

দৈহিক শক্তির এই অবিশ্বাস্য প্রচণ্ডতা দেখে জিভ শুকিয়ে গেল সবার। লোকটা মানুষ না দৈত্য?

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ল ওরা। মিরহাম আগে, তার পেছনে রানা, তারপর মাইজ চাপাহ, মো আ, শিরিন এবং সবশেষে সিকুবা আ।

বারকয়েক এদিক ওদিক বাঁক নিয়েই শেষ হয়ে গেল সুড়ঙ্গ পথ। প্রায় খাড়া ভাবে নেমে গেছে পাহাড়ের গা। সাত-আটশো ফুট নিচের দৃশ্যটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। ওপর থেকে বহু নিচে রূপালী একটা পাহাড়ী নদী আর তার পাশেই আবছা বনভূমি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

নদীটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে ডান দিকে। সবাই দেখল, ইংরেজি বর্ণমালার শেষ অক্ষর Z-এর মত একটা সরু পথ দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। পথটা

এদিকে ওদিকে এঁকেবেঁকে নেমে গেছে নিচের দিকে। এই পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নামা অসম্ভব বলে মনে হলো রানার কাছে। মর্গানের দল যে ঘোড়ায় চড়েই নেমেছিল সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

সবাই সম্মোহিত হয়ে পড়েছে।

মিরহাম তাকাল রানার দিকে, 'আগে আগে যাক সিকুবা আ। পড়লে ও-ই পড়ুক।'

সিকুবা আ কথাটা শুনতে পেলে কি ঘটত বলা যায় না। তাকে ডেকে নামার কথা বলামাত্র, ঘোড়ার পাঁজরে খোঁচা মারল সে পা দিয়ে। তার পেছনে রানার ঘোড়া এগোল। সবার পেছনে মিরহাম। মাইজ চাপাহর পিঠের দিকে তাক করা রয়েছে তার রিভলভারটা।

মাইজ চাপাহ গম্ভীর হয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে।

সোয়াশো ফুট নামার পর একটা প্রশস্ত ল্যান্ডিং পেয়ে থামল গোটা দল।

মিরহাম নির্দেশ দিল, 'সিকুবা, ভাল করে দেখ, কিছু তোর চোখে পড়ে কিনা।'

'লাল পাহাড়! মন্দির দেখতে পাই।'

'সত্যি?'

'দেখতে পাই।'

সিকুবার দু'পাশে ভিড় করল সবাই। চোখ কুঁচকে দেখবার চেষ্টা করছে সবাই, কিন্তু ঠাহর করতে পারছে না কিছুই—ধোঁয়াটে ঠেকছে নিচের দিকটা।

মাইজ চাপাহ বিনকিউলার বের করল। সেটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল মিরহাম। চোখে লাগিয়ে দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মন্দির! হ্যাঁ-হ্যাঁ, মন্দিরের চূড়া...লাল পাহাড়ের মাথায়!' রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে বিনকিউলারটা।

দেখল রানা।

একে একে সবাই দেখল। ইতোমধ্যে আবার নাচতে শুরু করেছে মিরহাম। রানা ভাবল, কেউ যদি সামান্য একটু ধাক্কা দেয় এখন, সাতশো ফিট নিচে গিয়ে পড়বে, অথচ খুশির চোটে খেয়াল নেই সেদিকে মিরহামের।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই ঝট করে তাকাল রানা মাইজ চাপাহর দিকে। হাতটা স্যাঁৎ করে টেনে নিল মাইজ চাপাহ মিরহামের পিঠের কাছ থেকে। তাকাল না রানার চোখের দিকে, যেন কিছুই হয়নি।

নিচু গলায় বলল রানা, 'আবার যদি দেখি...সাবধান...মনে থাকে যেন!'

'মনে না থাকে!' সিকুবা আ বলে উঠল, 'আমার কিছু মনে না থাকে!'

চারদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। দম আটকে আসতে চায়।

নামতে শুরু করল আবার ওরা। কেউ চুপ করে নেই এখন আর। যার যা খুশি বলছে। একটানা মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে মো আ। ভয় ও ভক্তি উপচে পড়ছে চেহারা থেকে। কথা থামালেই অখণ্ড নীরবতা গ্রাস করতে চায় ওদের—তাই আবোল-তাবোল যা খুশি বলে চলেছে সবাই।

'অস্ত্র চাইবে বলেছিলে না?' ফিসফিস করে জানতে চাইল শিরিন।

'বলেছিলে অস্ত্র ফেরত না দিলে...'

'সে সুযোগ বেরিয়ে গেছে হাত ফসকে।'

'খালি হাতে কি করে ঠেকাবে তুমি মিরহামকে? মাইজ চাপাহকে?'

উত্তর দিল না রানা। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখছে ও পাহাড়ের মাথা। যে গুহামুখ থেকে ওরা ঢুকেছে, সেটা পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা ফোকর। খাড়া উঠে গেছে দেয়াল আরও সাত আটশো ফুট। দুটো জলপ্রপাত নামছে নিচে। একটা ওপর থেকে, আর একটা মাঝখান থেকে। হলুদ রঙের রোদ লেগে রয়েছে পাহাড়ের মাথায়। সূর্য ডুববে খানিক পর। চারশো ফুট নেমে আবার থামল ওরা কয়েক মিনিটের জন্যে বিশ্রাম নিতে।

দূরে তাকাল রানা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছোট্ট লাল পাহাড়, তার চূড়োয় মন্দির। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ের গা হেলে রয়েছে মন্দিরের দিকে। মনে হয়, এক্ষুণি পড়ে যাবে হুড়মুড় করে। এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ওরা হাজার হাজার বছর ধরে, পড়ি পড়ি করেও পড়েনি।

প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে, পা ফসকে এই বুঝি পড়ল ঘোড়া। কিন্তু পড়ছে না একটাও। শান্ত, সতর্ক পাহাড়ী ঘোড়াগুলো ধীরে ধীরে নামছে লাইন বেঁধে। নামছে তো নামছেই। নিচে পৌঁছুতে প্রায় একঘণ্টা লাগল ওদের।

নেমেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সবাই। কার ঘোড়া কোথায় গেল, খোঁজ রাখল না কেউ।

সবাই টপাটপ কুড়োচ্ছে লাল পাথর। মাটিতে আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে মিরহাম, হামাগুড়ি দিচ্ছে মনের খুশিতে।

কুড়োচ্ছে শিরিনও। মো আ নিজেরগুলো রাখছে শিরিনের কাছে। মাইজ চাপাহ বড় পাথর ছাড়া হাতেই তুলছে না। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সবাই।

চুপচাপ রানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে শুধু সিকুবা আ। মিনিট দশেক পর সবাইকে এক জায়গা জড় করল মিরহাম।

রানা ওপর দিকে তাকাল, সরে গেছে সূর্যকিরণ।

'সূর্য ডুবল,' বলল ও। 'ঠিক এই সময় মর্গানকে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছিল হংগ।'

মিরহাম বলল, 'দিনের আলো থাকতে থাকতে মন্দিরে ঢুকতে চাই আমি, রানা।'

ওদের কথায় মন নেই রানার। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে ও। হাজার হাজার বছর ধরে এই রহস্যময় উপত্যকা এইখানে এইভাবে অবস্থান করছে, সভ্য জগতের কেউ জানে না। বলি দেয়া হয়েছে এখানে এই মন্দিরে কতশত নিরীহ মানুষকে। আত্মা বলে কিছু যদি থাকে, তারা এখন কোথায়?

ঘোড়া ছুটিয়ে নদী পেরিয়ে লাল পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। কিছুদূর উঠেই চোখে পড়ল মন্দিরের প্রবেশদ্বার। বন্ধ।

সবাই এসে দাঁড়াল বন্ধ দরজার সামনে।

এগারো

হাসি হাসি মুখ করে বসে আছেন দেবতা।

প্রশস্ত কপালে দু'টাকার রসগোল্লার সমান একটা পদ্মরাগ। জ্বল জ্বল করছে। বেদীমূলে রুপোর গোলাকার ঢাকনিটা আছে, কিন্তু চেনার উপায় নেই। কালো, শক্ত, জমাট বাঁধা রক্তের পুরু স্তর জমেছে ঢাকনির ওপর। মেঝের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে হাত, পা, পাঁজর, মাথা—মাংসহীন, চামড়াহীন খটখটে হাড়, মানুষের।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পাঁচ হাত হবে ঢাকনিটা। এক হাত দূরে দূরে একটা করে মোটা কড়া, মোট এগারোটা। ওগুলো ধরে টেনে তুলতে হবে ঢাকনিটাকে।

চেষ্টা চলছে। মিরহাম উৎসাহ দিচ্ছে মাইজ চাপাহকে, হাত লাগিয়েছে নিজেও। 'সাবাশ! মারো টান, হেঁইয়ো! মারো, মারো, মারো টান—হেঁইয়ো! হেঁইয়ো...'

এক চুলও নড়ছে না ঢাকনিটা।

সবার কাছ থেকে তফাতে, একধারে দাঁড়িয়ে আছে রানা। তার দিকে ইচ্ছা করেই তাকাচ্ছে না মিরহাম। ঢাকনিটাকে শত চেষ্টা করেও যখন তোলা গেল না, ওপরের ঠোঁট ও নাকের মধ্যবর্তী জায়গার নোনতা ঘাম জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে দরজার বাইরে, মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়ানো সিকুবা আ-র দিকে কটমট করে তাকাল মিরহাম।

'এই শালা, ঘোড়ার বাচ্চা! তোর হয়েছে কি? না দেখছিস, শক্তিতে কুলোচ্ছে না?'

সিকুবা আ বলল, 'আমি মার্মা, মিরহাম। নির্দোষ রক্ত বইছে আমার শরীরে। বলি দেবার লোক কোথায় যে মন্দিরের ভেতর পা দেব?'

স্থির হয়ে গেল সবাই। তাকাল সিকুবা আ-র দিকে। এতক্ষণে লক্ষ করল ওরা, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মো আ-ও। মন্দিরের ভেতর ঢোকেনি সে একবারও। দলের মধ্যে ওই দু'জনই নির্ভেজাল, খাঁটি মার্মা।

কারও মুখে কথা যোগাল না কয়েক সেকেন্ড। সেদিকে খেয়াল নেই সিকুবা আ-র। দেবতার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করছে সে, 'মনে না পড়বে কেন! কেন! কেন! কেন!' আবেগরুদ্ধ, ভাঙা কণ্ঠস্বর।

ধীরে ধীরে তাকাল মিরহাম রানার দিকে, 'সং সেজে দাঁড়িয়েই থাকবে তাহলে?'

রানা বলল, 'বললাম তো, ওভাবে চেষ্টা করলে ফল পাবে না। শাবল দিয়ে জমাট রক্তের স্তর তুলে ফেলতে হবে, তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে...'

'তোমার জেদই বজায় থাক।' মিরহাম বলল, 'কিন্তু শেষ জেদটা বজায় থাকবে আমার। সিকুবা, মো আ-র সাথে নদীতে যা।'

মালপত্রের মধ্যে থেকে একটা শাবল বের করে দিয়ে বালতি নিয়ে চলে গেল মো আ আর সিকুবা আ নদীর দিকে।

রক্তের জমাট স্তর তুলে ফেলতে পনেরো মিনিট লাগল। বালতি বালতি পানি ঢেলে ধুয়ে ফেলা হলো রুপোর বেদীটা।

এবার সিকুবা আর মো আ ছাড়া বাকি সবাই হাত লাগাল। কিন্তু অবস্থা প্রায় তথৈবচ। নড়েচড়ে, কিন্তু তোলা যায় না ঢাকনিটা।

'সিকুবা আ!' অসহায় শোনাল মিরহামের কণ্ঠস্বর, 'আয় না, ভাই। চিন্তা করিস না, তোর বলির জন্যে লোক জোগাড় করে দেয়া যাবে।'

মন্দিরের ভিতর ঢুকল সিকুবা আ। লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা এগিয়ে এল সে। কিন্তু ঢাকনির সামনে না থেমে, উঠে দাঁড়াল ওপরে। তারপর চোখ বুজে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে পড়ল ঠিক মাঝখানটায়।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা কয়েক সেকেন্ড।

'সিকুবা আ, উঠছিস না কেন?'

'না উঠব।' চোখ বুজে বলল সিকুবা আ, 'যতক্ষণ বন্ধুর কথা না মনে আসবে, থাকব বসে। আর যে আমাকে এখান থেকে ওঠাতে আসবে তাকেই ধরে বলি দেব।'

মাইজ চাপাহ খালি হাতটা বুকের কাছে তুলে আঙুলগুলো বাঁকা করল রিভলভার ধরার ভঙ্গিতে। তারপর ট্রিগার চেপে ধরার ভঙ্গিতে তর্জনীটা নাড়ল, সেই সঙ্গেই কাত্ করল নিঃশব্দে মাথাটা মিরহামের উদ্দেশে। অর্থাৎ গুলি করে আপদটাকে শেষ করে দেয়া যাক।

কোমরে বাঁধা স্কার্ফের পকেটে হাত ঢুকে গেল মিরহামের। পেছন থেকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা তাকে। বেদীর ওপর সিকুবা আ-র কাছে গিয়ে বসল সে।

'শোনো,' রানা একটা হাত রাখল সিকুবা আ-র বিশাল কাঁধে, 'আচ্ছা, তোমার বন্ধু আমাকে বিশ্বাস করতে, আমার কথা মানতে বলেছিল—মনে আছে?'

চোখ মেলে সরল, ভাল মানুষের দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে তাকাল সিকুবা আ। 'আছে। এইটুকু মনে আছে, কিন্তু আর কি বলেছিল মনে না আসছে।'

রানা বলল, 'আসবে। বিশ্বাস করো···আমি বলছি আসবে। তুমি দুশ্চিন্তা না করে কাজে হাত দাও, ঠিক মনে আসবে।'

'কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি।'

'কথা দিচ্ছ মনে আসবে?'

'আসবে।'

উঠে দাঁড়াল সিকুবা আ। 'আর কোন চিন্তা নেই।' শিশুর মত সরল, অবুঝ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কদাকার মুখটা, 'বন্ধু কথা দিয়েছে···'.

বেদী থেকে নেমে ঝুঁকে পড়ে একাই ধরল একদিকের দুটো কড়া। বলল,

'থাদুগুয়াঙের কিরা…'

ফুলে উঠল সিকুবা আ-র দুই হাতের মাংসপেশী।

সিকুবা আ-র উল্টো দিকে মিরহাম। মাইজ চাপাহ আর রানা ধরেছে তিনটে কড়া। প্রাণপণ শক্তিতে টেনে ছ'ইঞ্চি মত উঁচু করল ওরা তিনজন, অপর দিকটা সিকুবা আ একাই তুলে ফেলেছে তিন ফুট উঁচুতে।

অতি সাবধানে একপাশে সরিয়ে আনল ওরা ঢাকনিটা। বেশ বড়সড় একটা গহ্বর দেখা গেল।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। মাথাগুলো একত্রিত হলো গহ্বরের ওপর, পাশাপাশি। ছোট্ট একটা ঘরমত দেখা যাচ্ছে নিচে। সবার চোখের দিকে চেয়ে হাসছে গহ্বরটা। কেমন মজা হলো! কেমন মজা হলো!—গহ্বরটা যেন ব্যঙ্গ করছে ওদের সবাইকে। শূন্য গহ্বর। লাপাত্তা হয়ে গেছে লাল মন্দিরের সমস্ত রুবি।

শীতল, কঠিন একটা হাত খেলা করছিল রানার হৃৎপিণ্ডটাকে নিয়ে, শূন্য গহ্বর দেখে সেই হাত যেন বজ্রমুঠিতে চেপে ধরল সেটাকে।

অসুস্থ হয়ে পড়ল মিরহাম। মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপের মত নতিয়ে পড়ল সে মেঝেতে। চিৎকার করে উঠে মেঝেতে আছড়ে পড়ল মাইজ চাপাহ। ওপর দিকে হাত পা ছুঁড়ছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে স্তূপীকৃত কঙ্কালগুলোর সঙ্গে।

'কিসের লোভে এলাম! পুলিস আমাকে খুঁজবে। খুন করে এসেছি দু'জন কনস্টেবলকে…' ফুঁপিয়ে উঠল সে।

কারও কথা কানে ঢুকছে না রানার। সিকুবা আ-র দিকে তাকিয়ে আছে ও।

মুচকি মুচকি হাসছে সে।

'হাসছ কেন?'

চমকে উঠল সিকুবা আ, মুছে ফেলল মুখের হাসি। ধরা পড়ে গেছে, কিন্তু মুখে স্বীকার করল না সে। 'কই? না—না হাসছি আমি।'

কথা না বাড়িয়ে গহ্বরের ভিতর আবার তাকাল রানা। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে ওর। ভাবছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখটা।

'মিরহাম, ওঠো।'

এমন কিছু ছিল রানার কণ্ঠে, চুপ হয়ে গেল সবাই।

'আমার মনে হয় এখানেই আছে রুবি।'

'কই?' তড়াক করে উঠে বসল মিরহাম। 'দেখতে পাচ্ছি না কেন তাহলে?'

'আঁধার হয়ে এসেছে। মশাল জ্বালার ব্যবস্থা করো, দেখি ভাল করে।'

'ঠিক, ঠিক!' একযোগে চিৎকার করে বলল সবাই, 'মশাল জ্বালো! মশাল জ্বালো! মশাল জ্বালো…'

তীরবেগে বেরিয়ে গেল মিরহাম, মালপত্রের মধ্যে থেকে বের করে নিয়ে

এল একটা মশাল। রানার গ্যাস-লাইটার দিয়ে জ্বালা হলো সেটা। থরথর করে কাঁপছে মিরহামের হাত।

শুয়ে পড়েছে রানা। ডান হাতটা নামিয়ে দিয়েছে গহ্বরের ভিতর। রানার মাথার ওপর ধরল মিরহাম মশাল।

সাপ-টাপ নেই তো?

কিছু যেন ঠেকল হাতে, তুলোর মত, কিন্তু রোয়া বিশিষ্ট। আরও কয়েক ইঞ্চি নেমে গেল রানার বুক গহ্বরের ভিতর। খামচে ধরল জিনিসটা।

সিধে হয়ে উঠে বসল রানা।

একটা বাঘের ছাল ওর হাতে।

রানার পিঠের ওপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মিরহাম।

জ্বল জ্বল করছে পদ্মরাগ মণিগুলো। পাহাড়ের মত করে সাজানো। ঠিক যেন ছোট্ট একটা লাল পাহাড়। মশালের আলো নিয়ে খেলা করছে মণিগুলো। অদ্ভুত মায়াখেলার মত লাগছে দেখতে। আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।

ছোট্ট পাহাড়টার দিকে একনজর চেয়েই বুঝতে পারল সবাই, আসল রুবি কাকে বলে। ওরা যেগুলো পাগলের মত কুড়িয়েছে, এগুলোর পাশে সে সব একেবারে নিষ্প্রভ—বি গ্রেড। বোঝা যাচ্ছে, অনেক খুঁজে অনেক বাছাই করে সাফা রুবি তোলা হয়েছে পবিত্র মন্দিরে।

ক্যানভাসের তেরপল বিছানো হয়েছে। সিকুবা আ নেমে গেছে গহ্বরের ভেতর। ওপরে মিরহাম। সিকুবা আঁজলা ভরে তুলে দিচ্ছে লাল চুনি পাথর। এক আঁজলায় ছোটবড় মিলিয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা করে উঠছে। মটরশুটির দানার সমান থেকে নিয়ে, বড় সাইজের মারবেলের সমান বিভিন্ন আকারের রুবি। সিকুবার হাত থেকে নিয়ে তেরপলের ওপর রাখছে মিরহাম।

চায়ের মগ এনে দিয়েছে মো আ। আধসের পানি ধরে মগটায়। চুনি পাথরের স্তূপ থেকে এক মগ করে তুলে নিয়ে আলাদা একজায়গায় রাখছে রানা।

সম্মোহিতের মত চেয়ে চেয়ে দেখছে শিরিন, মো আ আর মাইজ চাপাহ। মো আ-র চোখের কোণে চিকচিক করছে পানি।

'বত্রিশ মগ।' রানা গুনছে, 'আর তিন মগ হবে।'

উঠে পড়ল সিকুবা আ। রানার পাশে বসল মিরহাম, 'বিক্রি করলে কত টাকা হবে?'

মাইজ চাপাহ বলল, 'কমপক্ষে পঞ্চাশ লাখ টাকা।'

'গাধার বাচ্চা! তুই কি জানিস?' মিরহাম বলল, 'লেখা-পড়া শিখেছিস অ আ ক খ—ব্যস! চুপ থাক তুই! আমি বলি পঞ্চাশ কোটি টাকা তো হবেই। তার কম নয়!'

দু'জনের কারও অনুমানই সম্ভাব্য মূল্যের কাছাকাছি নয়, ভাবল রানা। ঠিক কত দাম হবে, ও নিজেও জানে না। পদ্মরাগের মূল্য সঠিক জানা নেই

ওর। পাঁচ রতি একটা চুনি সোহেল কিনেছিল, বছর আষ্টেক আগে, তখনই দাম পড়েছিল দশ হাজার টাকা। সেই হিসেবে···মাথা ঘুরতে শুরু করল রানার। অসম্ভব মনে হলো পঁয়ত্রিশ মগ ভর্তি পদ্মরাগের মূল্য অনুমান করা। দশ কিংবা পঁচিশ হাজার কোটি টাকা হওয়াও বিচিত্র নয়। কিংবা হয়তো তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি।

'মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।' বলল ও, 'তবে যদি সমান ভাগে ভাগ করা হয়, প্রত্যেকে যা পাবে, বিক্রি করলে, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ হয়ে যেতে পারবে।'

'ভাগ করো, ভাগ করো!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল মিরহাম। 'চালাকি করবে না, রানা। একটা রুবিও যেন কারও ভাগে বেশি না পড়ে। সমান চার ভাগে ভাগ করো।'

'চার কেন? তিন ভাগ।' বলল মাইজ চাপাহ।

'তিন কেন? ছয় ভাগ হবে।' বলল রানা।

'বন্ধুত্ব না ঝগড়া—কোন্‌টা চাই তোমাদের?' রিভলভারটা বের করে ফেলল মিরহাম। সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'আমি নেতা। তৃতীয় নয়ন তো নেবই, চারভাগের আমি নেব দুই ভাগ, মাইজ চাপাহ একভাগ, রানা একভাগ। হলো চারভাগ? এই আমার শেষ কথা।'

তবু সবাই চুপ। আর একটু ব্যাখ্যা করল মিরহাম। 'মেয়েমানুষ হিসেবের বাইরে—আগেই বলেছি আমি। আর সিকুবা আ হচ্ছে সাচ্চা মার্মা, জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, পবিত্র মন্দিরের একটা পাথরও নেবে না ও।'

'নেবে,' বলল মো আ। 'গুহা থেকে বেরিয়ে পাথর নেয়ায় কোন দোষ নেই।'

'কিন্তু মো আ আর শিরিনও তো আমাদের সঙ্গে এসেছে। ভেবে দেখো, কষ্ট ওদের কেউ আমাদের চেয়ে কম করেনি। ওদেরকে ভাগ না দেয়া অন্যায় হবে, মিরহাম।'

'অন্যায় হবে?' মিরহাম বলল, 'বেশ। ন্যায়ের রাজা, তোমার ভাগ থেকে ওদেরকে দাও। দেবে, রানা?'

হাসল রানা। 'দেব, মিরহাম। আমি লোভী নই। সেটা বুঝতে পেরেই নকশা এঁকে দিয়েছিল রড়ি আঁফা। ডাকাতি করতে আসিনি আমি এখানে।'

'মানুষের মত মানুষ!' মো আ বলল।

রানা বলল, 'আমারটা আমি তিন ভাগ করব। একভাগ নেবে সিকুবা আ, একভাগ শিরিন, আর একভাগ···' রানা তাকাল মো আ-র দিকে।

'আর একভাগ?' মিরহাম সাগ্রহে জানতে চাইল।

'মো আ নেবে।'

'তুমি নেবে না?'

'না।'

'এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে।' মাইজ চাপাহ বলল, 'সুবিধের মনে হচ্ছে না। মিরহাম, ভাগ হোক। আমার ভাগটা আমি আলাদা করে রাখতে চাই।'

'ষড়যন্ত্র, রানা?' মিরহাম গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল।

'কোথায় দেখলে ষড়যন্ত্র? আমি যদি নিতে না চাই, কার কি বলার থাকতে পারে?'

মাইক্ত চাপাহর দিকে তাকাল মিরহাম, 'ঠিকই তো। ষড়যন্ত্রটা কোথায় দেখলি, মাইক্ত?'

'ওসব বাজে কথায় কাজ নেই আমার।' মাইক্ত চাপাহ বলল, 'ভাগ করো। আমার ভাগ নিয়ে আমি সরে যেতে চাই। যাবার সময়, সবাই আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়াই ভাল।'

'তা হবে না।' চেঁচিয়ে বলল মিরহাম, 'তা হতে দেব না আমি। মিলেমিশে এসেছি আমরা এক সঙ্গে। ফিরে যাব সেই ভাবেই। একজোট থাকলে শক্তি বাড়ে। কিন্তু সে আলোচনা পরে। রাত বাড়ছে। খাইদাই, চলো, তারপর ঘুম দিই। ভোর বেলা ঠাণ্ডা মাথায় ভাগ বাটোয়ারা করা যাবে।'

রানা বলল, 'তাই ভাল।'

'মনে থাকে যেন, চার ভাগই হবে, ছয় ভাগ না।' কটমট করে চাইল মাইক্ত চাপাহ রানার দিকে।

'মনে না থাকে, কেন মনে না থাকে...।' বিড় বিড় করছে সিকুবা আ। বিকৃত হয়ে গেছে মুখের চেহারা। দুই হাতে মাথার চুল টানছে সে।

মন্দিরের বাইরে আগুন জ্বালা হলো। রান্নাবান্নার পর খাওয়া দাওয়া শেষ হতে রাত হয়ে গেল অনেক। গাছের নিচে যার যেদিকে খুশি বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল।

শিরিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সাবধান করে দিল রানা, 'ঘুমানো চলবে না, বুঝলে?'

'জানি।' শিরিন ফিসফিস করে বলল, 'আগেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'কে? কে সাবধান করল?'

'মো আ।' বলল শিরিন, 'ওই দেখো আবার চা চড়াচ্ছে তোমার জন্যে।'

মাথা তুলে তাকাল রানা। চেয়ে আছে মো আ। বুড়ি হাসছে।

মিরহাম বা মাইক্ত চাপাহ, কারোই আজ রাতে ঘুমাবার কথা নয়, কিন্তু খানিক বাদেই দুইজনের নাক ডাকার শব্দ শুনে বিস্মিত হলো রানা। অভিনয় করছে না তো?

আগুনের কাছ থেকে চায়ের মগ হাতে উঠে এল মো আ, আঙুল তুলে মিরহামকে দেখাল, 'লক্ষ্মী ছেলে ও আমার। কিন্তু বড্ড একরোখা। তাই, চায়ে ওষুধ না মিশিয়ে উপায় ছিল না। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে ওরা দুজন।'

রানা উঠে বসল।

'দেরি কোরো না, রানা।' মো আ বলল, 'চলো, গুছিয়ে নিই আমরা।'

'তার মানে?'

'বুঝলে না?' মো আ আকাশ থেকে পড়ল, 'তোমাদের সঙ্গে যাব আমি। তোমার বউয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে যে আমার।'

লজ্জা পেল শিরিন। বলল, 'মো আ ঠিক করেছে, তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবে আমার। আমাদের বাড়িতে থাকবে ও, দেখাশোনা করবে।'

রানার মুখে কথা ফুটল না।

'মিরহাম খুন করবে সবাইকে,' বলল মো আ। 'একটা পাথরও দেবে না ও কাউকে। আমার ছেলে, চিনি আমি। আমাকেও ছাড়বে না। দেবতা-দর্শন হয়ে গেছে, চলো, এইবেলা পালাই আমরা।'

শিরিন বলল, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে রানা! ওঠো!'

সিকুবা আ বসে আছে পদ্মাসনে। চেয়ে আছে ওদের দিকে। রানা সেদিকে তাকাতে মো আ বলল, 'ওকেও সঙ্গে নেব আমরা। ঝামেলা। কিন্তু খাঁটি মার্মা ওই সিকুবা আ। ওকে ওর গ্রামে পৌঁছে দিলেই হবে। চা দিয়েছিলাম, কিন্তু খায়নি।'

রানা বলল, 'সিকুবা, আমরা এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছি। যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে?'

'না।' সিকুবা আ বলল। ঠায় বসে রইল একই ভঙ্গিতে। 'যতক্ষণ কথাটা না আসবে মনে, ততক্ষণ এই জায়গা ছেড়ে কেউ না যাবে কোথাও।'

'কি!' মো আ চেঁচিয়ে উঠল, 'শেষ পর্যন্ত যদি কোনদিনই কথাটা তোর মনে না পড়ে? আমি মরে যাব, সবাই বুড়ো হয়ে যাবে...'

হাত বাড়িয়ে তুলে নিল সিকুবা আ তার প্রিয় কুঠারটা। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় চকচক করছে কুঠারের ইস্পাতের তৈরি ধারাল ফলা। প্রকাণ্ড মাথাটা নামিয়ে দেখল সেটা সিকুবা আ, তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে, 'হ্যাঁ। সবাই বুড়ো হয়ে যাব আমরা। তারপর, মরে যাব। তবু এই জায়গা ছেড়ে কাউকে না যেতে দেব আমি।'

পঁচিশ হাত দূরেই কুলকুল শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে নদীটা। আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

বারো

সবার শেষে ঘুম থেকে উঠল রানা।

বাগ মানানো যায়নি সিকুবা আ-কে। নানান ভাবে চেষ্টা করেও কিছুতেই বোঝাতে পারেনি রানা ওকে যে পালানো দরকার। ঘুমোতেও রাজি হয়নি সে। কারও কোন কথাই আর শুনতে রাজি নয় সে। অগত্যা পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়েছে ওদের।

নাস্তা খেতে খেতে রানাকে বারবার আকাশের দিকে চাইতে দেখে জানতে চাইল মিরহাম, 'কি দেখছ?'

'দেখছি আজরাইল আসছে কি না,' বলল রানা।

কথাটায় খুবই মজা পেল মিরহাম। হো হো হাসল প্রাণ খুলে। হাসি

থামিয়ে মো আ-কে বলল জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে তৈরি হতে। খানিক বাদেই রওনা হবে ওরা।

'ভাগাভাগি হয়ে যাক, মিরহাম,' বলল মাইজ চাপাহ। 'আমার ভাগটা দিয়ে দাও।'

'দাঁড়া।' বলেই ছোরা বের করল মিরহাম। ছোরা হাতে দেবতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ ছোরার আগা দিয়ে কয়েকটা চাড় দিতেই উঠে এল দেবতার তৃতীয় নয়ন। ওটাকে বাম হাতের মুঠিতে চেপে ধরে বলল, 'আমি অমর!'

'বেশ, বেশ। এবার পাথর ভাগ করতে বলো রানাকে।'

নেকড়ের হাসি হাসল মিরহাম। মাথা নাড়ল মন্ত্রমুগ্ধের মত।

'অমর আমি! তোরা মরে যাবি…তুই, রানা, মো আ, সিকুবা, শিরিন—সবাই মরবি, কিন্তু আমার মৃত্যু হবে না। তোদের মৃত্যুর পরেও হাজার হাজার লক্ষ বছর ধরে বেঁচে থাকব আমি। খরচ আছে না? খেতে পরতে হবে না? তোরা আজ আছিস কাল নেই। তোদের চেয়ে টাকার দরকার আমার অনেক বেশি। ভাগ-টাগ হবে না, রুবি যা আছে সবটা আমারই লাগবে।'

বসেছিল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাইজ চাপাহ। কিন্তু রাইফেলটা মিরহামের দিকে তাক করে ধরতে গিয়ে থমকে গেল মাঝপথে। মিরহামের হাতে বেরিয়ে এসেছে রিভলভার, সোজা ওর বুকের দিকে স্থির হয়ে আছে লক্ষ্য।

'খবরদার! রাইফেল ফেলে দে, মাইজ চাপাহ!'

মো আ আর শিরিন ব্যস্ত ছিল ঘোড়ার পিঠে মালপত্র তোলার কাজে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল নিচু গলায়, তাই মিরহামের বক্তব্য কিছুই কানে যায়নি ওদের। চড়া, কর্কশ গলায়, 'খবরদার!' শুনে চমকে চাইল ওইদিকে।

খটাশ করে মাটিতে পড়ল মাইজ চাপাহর রাইফেল।

'খুন খারাবির কি দরকার, মিরহাম?' নরম গলায় বলল রানা। 'ভাগ দিতে না চাও ভাগিয়ে দাও। খুনোখুনি শুরু হলে কে বাঁচবে, কে মরবে বলা যায় কিছু?'

'যায়,' আত্মবিশ্বাসী হাসি মিরহামের মুখে। 'তোমরা মরবে। আমি বাঁচব। আমি অমর!'

'আমাদের খুন করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছ তাহলে?'

'হ্যাঁ। সবাইকে। কিন্তু বিশেষ করে তোমাকে, রানা।'

'কেন? ভুলে গেছ, বহুবার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি আমি তোমাকে, মিরহাম?'

'ছেড়েছ। ঠিক। কিন্তু কেন ছেড়েছ সে তুমিই জানো। আমি কারণ দেখি না। তবে আমি কেন তোমাকে খুন করব তার কারণ আমি দেখাতে পারি।'

'কি কারণ?'

'চুচ্যাং তাগলকে খুন করেছ তুমি।'

'না করে উপায় ছিল না।'
'উচা হ্লাকে খুন করেছ তুমি।'
'প্রত্যাখ্যান করেছি, খুন করিনি।'
'এই কারণ। যাও, শিরিনকে নিয়ে দাঁড়াও গিয়ে মাইক্ত চাপাহর পাশে। বিশ্বাস করো, অনেক কষ্টে সহ্য করেছি আমি তোমাকে এতদিন—শেষ করে দিতে পারিনি শুধু দুটো কারণে। তোমাকে খুন করলে পৌঁছোতে পারতাম না এখানে।'
'আর দ্বিতীয় কারণ?' কারণ জানবার জন্যে নয়, শুধু কিছুটা সময় নষ্ট করবার জন্যে জিজ্ঞেস করল রানা।
'দ্বিতীয় কারণ এই তৃতীয় নয়ন,' হাতের মুঠো খুলে প্রকাণ্ড রুবিটা দেখাল মিরহাম। 'এটা হাতে না পেয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না তোমার ব্যাপারে। সব সময় ছোট হয়ে ছিল মনটা। ভয় ছিল, তোমাকে মারতে গেলে মারা পড়ব আমি নিজে। হ্যাঁ। তোমাকে যমের চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি আমি এতদিন।' গলার সুর পাল্টে গেল ওর। 'কই, হাতে সময় নেই আমার। দাঁড়িয়ে যাও লাইন দিয়ে।'
'মিরহাম, বাবা, মেরো না ওদের।'
মিরহামের পেছন থেকে ভেসে এল গলাটা। একটা মালবাহী ঘোড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মো আ। কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে বলল, 'রানার বন্দুকটা আমার হাতে, মিরহাম। তোমার পিঠের দিকে ধরা।'
নড়ল না মিরহাম। তাকাল না পিছনে।
'গুলি করবি? নিজের সন্তানকে গুলি করবি, মো আ?'
'জানি না, বাবা। পারব কি না জানি না। চেষ্টা করব।'
'আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে যদি গুলি করি?'
'তুমিই জানো, মিরহাম।'
চেঁচিয়ে উঠল মিরহাম, 'বুড়ি মাগী, কলজে খাব তোর!' বলল বটে, কিন্তু পেছন ফেরার সাহস হলো না তার। নিজের মাকে কে না চেনে? 'রাইফেল ফেলে দে, মো আ!' মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করছিল সিকুবা আ এতক্ষণ চোখ বুজে, ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে এই দিকে।
কুঠারের হাতলে হাত বুলোচ্ছে সে। মো আ-র উদ্দেশে আবার বলল মিরহাম, 'আর ওই ঘোড়ামুখোটাকে বল্ কুড়োল ফেলে দিতে। গোলমাল করলেই গুলি খাবে। তোর আর ওর কোন ক্ষতি করব না আমি।'
'বাকি সবাইকে খুন করবে?' বুড়ি জানতে চাইল।
'বেজন্মা মাগী, তোদের মার্মা-কানুন কি বলে? পবিত্র মন্দিরে খাঁটি মার্মা ছাড়া কেউ ঢুকলে প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারবে না। না আছে এই নিয়ম? খাঁটি মার্মা ছাড়া...'
বিকট এক চিৎকার করে লাফ দিয়ে কয়েক হাত ওপরে উঠে গেল সিকুবা আ। ভয়ঙ্কর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে। ধুপ করে মাটিতে নেমেই নাচতে শুরু করল। আদিম, জংলী নাচ। আবার একবার কলজে

কাঁপানো উল্লাসধ্বনি করে, হাতের কুঠারটা অদ্ভুত কায়দায় সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে দিল সে ওপর দিকে কিছুদূর ওঠার পর রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠল কুঠারের চকচকে ইস্পাতের ফলা। বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস কেটে বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে উঠে যাচ্ছে সেটা আরও ওপরে।

সবাই দেখছে কুঠারটাকে, মাথা উঁচু করে। উঠে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে··· চেনা যাচ্ছে না এখন আর, গোল একটা চরকির মত লাগছে দেখতে।

ওপর দিকে চেয়ে নেই একমাত্র সিকুবা আ। নাচছে সে।

'মনে পড়েছে! কী মজা!'

উপজাতীয় আনন্দ নৃত্য আগেও দেখেছে রানা। কিন্তু সিকুবা আ-র নাচের সাথে সেসব নাচের কোনই মিল নেই। প্রকাণ্ড দানবটা চোখ বুজে পিঠ বাঁকা করে ডিগবাজি খাচ্ছে পেছন দিকে, উঠে দাঁড়াচ্ছে বিদ্যুৎবেগে, এপাশে ওপাশে দুলছে, আচমকা আবার হেলে পড়ছে ডান দিকে, তারপর বাঁ দিকে ছন্দোবদ্ধভাবে। আবার ডিগবাজি খেয়ে চলে আসছে সামনে।

'মনে পড়েছে!' সুর করে নাচের সঙ্গে গাইছে সিকুবা আ, 'মিরহাম বলতেই—কী মজা! মনে পড়েছে কী মজা! মনে পড়েছে বন্ধুর সব কথা!' ডিগবাজি খেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ডান দিকে বাঁ দিকে দুলছে সে, দুই কোমরে হাত, মাথাটা কখনও এই পিছনে, এই সামনে নিয়ে আসছে, নিয়ে যাচ্ছে। 'আহ্। বুকটা আমার হালকা হয়ে গেল! বন্ধু, তোমার কথা মনে এসেছে—কী মজা! কী মজা! আমাকে দিয়ে কিরে কাটিয়ে নিয়েছিলে, কী মজা! তোমার কথা রাখব আমি, কী মজা! কত খুশি আমি, কী মজা।'

'তার মানে?' সিকুবার দিকে এক পা এগোল রানা, থামল। 'তুমি কি বলতে চাইছ, রুবি-মন্দিরে মার্মা ছাড়া আর যারা ঢুকেছে তাদেরকে জীবিত বেরিয়ে যেতে দেবে না···?'

সশব্দে শুয়ে পড়ল সিকুবা, সটান।

দম বন্ধ করে কুঠারটাকে নামতে দেখছে সবাই। সাঁই সাঁই করে নেমে আসছে। সিকুবা আ-র মাথার ওপর পড়বে সেটা। শেষ মুহূর্তে, কুঠারটা যখন দশ হাত ওপরে, তখন ডান হাতটা ওপরে তুলল সিকুবা আ। নিপুণ কায়দায় ধরে ফেলল কুঠারের হাতল। ধরেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

অনেক সার্কাস দেখেছে রানা। সার্কাসে হরেক রকম বিস্ময়কর খেলাও দেখেছে। কিন্তু সিকুবা এইমাত্র যে খেলাটা দেখাল সেটা যাদুমন্ত্রের মত অলৌকিক কাণ্ড বলে মনে হলো। কিন্তু মুগ্ধ বা বিস্মিত হবার চেয়ে ভয়ই পেয়েছে সে বেশি···সিকুবার কথায়।

'কি বলছ তুমি, সিকুবা?' এক পা এগিয়ে গেল সে। 'কি বলছ তুমি?'

একগাল হাসল সিকুবা আ। 'মনে এসেছে! মনে এসেছে আমার! খুন করতে হবে।'

'কাকে? কাকে খুন করতে হবে?'

নাচতে শুরু করেছে আবার সিকুবা আ। মাথার ওপর বন বন করে

ঘোরাচ্ছে কুঠার। বলল, 'সবাইকে। মো আ ছাড়া সবাইকে।'

'আমি আর শিরিন তো নিজের ইচ্ছায় আসিনি এখানে, সিকুবা। কোন দোষ করিনি আমরা। আমাদের মারবে কেন? ভেবে দেখো, তোমার বন্ধু বিশ্বাস করতে বলেছিল আমাকে, মানতে বলেছিল আমার কথা। সে নিশ্চয়ই আমাদের খুন করতে বলেনি তোমাকে?'

'বলেছে। নাম ধরে বলে গেছে। আমার বন্ধু আর আমি এই জন্যেই সঙ্গ নিয়েছি ডাকু মিরহামের। আমাদের পাঠানো হয়েছিল মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করতে।'

'কিন্তু সিকুবা, ভাব। ভেবে দেখো। প্রাণ বাঁচিয়েছি আমি তোমার।'

সিকুবা নাচছে, রানার কথা কানে ঢুকছে না তার। তাণ্ডব নৃত্যে মাটি কাঁপছে। বিকৃত হয়ে গেছে মুখের চেহারা। ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে।

ঠিক এমনি সময়ে গুলি করল মিরহাম। মুহূর্তে থেমে গেল নাচ। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সিকুবা আ। বাঁ হাতটা ঝুলে পড়ল। বাঁ দিকের কাঁধে লেগেছে গুলি। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাঁকি দিল সে ডান হাতটা। বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল কুঠার। এক পাক ঘুরে ঘ্যাঁচ করে বিঁধল সেটা মিরহামের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় উড়ে চলে এল সিকুবা আ মিরহামের পাশে। সেখান থেকে এক লাফে চলে গেল মাইজ চাপাহর পাশে ওকে রাইফেল তুলতে দেখে। প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে খসে পড়ল মাইজ চাপাহর হাতের রাইফেল, ছিটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে মন্দিরের সিঁড়ির ওপর।

পিঠে ধাক্কা খেল রানা। ধাক্কা দিচ্ছে মো আ।

'পালাও! পালাও, রানা!'

ঘুরেই দেখতে পেল রানা দৌড়াচ্ছে শিরিন। নদীর দিকে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথের দিকে।

মিরহামের দিকে চাইল রানা। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। কুঠারটা টেনে বের করার চেষ্টা করছে বুক থেকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক। রক্ত লেগে গেছে হাতের মুঠোয় ধরা রাঙা পদ্মরাগেও। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল সে মণিটার দিকে। দেবতার তৃতীয় নয়ন সঙ্গে থাকতেও মরতে হচ্ছে কেন তাকে! রানার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল সে হতাশ ভঙ্গিতে। কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠোঁট নড়ল কেবল, আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। টলতে টলতে কয়েক পা সামনে এগিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আবার ঠেলা দিল মো আ রানার পিঠে। 'পালাও! প্রাণে বাঁচবে না!'

ছুটল রানা। পিছনে ছুটছে মো আ-ও। তার পেছনে গুণ্ডা।

ছুটতে ছুটতে পেছন ফিরে চাইল একবার রানা। টান মেরে মিরহামের বুক থেকে কুঠারটা বের করে নিয়েছে সিকুবা আ। রানার পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে মনে পড়ল মাইজ চাপাহর কথা, ঘুরে দাঁড়াল আবার।

নদীর ওপারে পৌঁছে আবার পিছন ফিরে চাইল রানা। ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেল সে মাইজ চাপাহকে। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল মাইজ চাপাহ, মুখের মধ্যে ঢুকে গেছে কুঠার। এক ঝটকায় সেটা বের করে নিয়েই ঘাড়ের

ওপর কোপ বসাল সিকুবা আ।

শিউরে উঠল রানার সর্বশরীর। শক্তি পাচ্ছে না হাঁটতে, মনে হচ্ছে এখুনি পড়ে যাবে সে হাঁটু ভাঁজ হয়ে। 'Z' অক্ষরের মত বিপজ্জনক পথটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। হাঁপাচ্ছে।.

'পালাও!' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল মো আ। 'আসছে সিকুবা! পালাও!'

খালিহাতে সিকুবাকে ঠেকাবার সাধ্য ওর নেই, জানে রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার ছোরাটা আমাকে দাও, মো আ!'

'ছোরা নাই।'

'রাইফেলটা ফেলে এলে কেন?'

'গুলি ছিল না। দৌড়োও। এসে গেল!'

নদীর ওই পারে দেখা গেল সিকুবা আ-কে। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'তুমি শিরিনকে নিয়ে উঠে যাও ওপরে। আমি দেখি কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়।'

'না-পারবে! পালাও! রানা, পালাও!' কেঁদে ফেলল মো আ। 'থাদুত্তুয়াঙের কিরা, পালাও!'

নদীতে নামল সিকুবা আ। হাঁটু পানির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে। গুণ্ডাকে লেলিয়ে দিল রানা ওর দিকে। কি করতে বলা হচ্ছে বুঝতে না পেরে প্রথমটায় একটু থতমত খেল গুণ্ডা, কিন্তু রানা দ্বিতীয়বার ইশারা করতেই প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছেড়ে ছুট দিল সে সিকুবা আ-র দিকে। মো আ-র হাত ধরল রানা। 'চলো।'

আছড়ে পাছড়ে উঠে যাচ্ছে তিনজন পাহাড় বেয়ে। একশো ফুট উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ল মো আ।

'নাহ্! না হবে!' হাঁপাচ্ছে মো আ হাপরের মত। 'তোরা যা, বাপ্! আমি বুড়ি থাকব এইখানে। পা চলে না আর।'

'নাহ্!' ছুটে এসে বুড়ির হাত ধরল শিরিন। 'তোমাকে ফেলে যাব না!'

শিরিনের মাথায় হাত বোলাল বৃদ্ধা, গালে হাত বুলিয়ে চুমো খেল আঙুলের মাথায়।

'আমাকে না মারবে সিকুবা। তোদের মারবে। তোরা যা, আমি পরে যাব। ঘোড়ায় চড়ে। তোদের এই মা সিকুবাকে আটকে রাখবে, যতক্ষণ পারা যায়।'

ওদিকে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে গুণ্ডা সিকুবা আ-র উপর, কামড়ে ধরছে হাত বা পা। কয়েক পা এগিয়েই থামতে হচ্ছে ওকে গুণ্ডার আক্রমণ প্রতিহত করতে। মাঝে মাঝে লাফ দিচ্ছে গুণ্ডা ওর কণ্ঠনালি কামড়ে ধরার চেষ্টায়। ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে সিকুবা আ-কে। শেষ পর্যন্ত ত্যক্ত হয়ে সিকুবা আ-কে কুঠার তুলতে দেখে হুইসেলে ফুঁ দিল রানা। সিকুবা আ-কে ছেড়ে দূরে সরে গেল গুণ্ডা। গেল ঠিকই, কিন্তু সুযোগ খুঁজছে সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার।

তিনশো ফুট ওপরে উঠে গেছে রানা আর শিরিন। তর তর করে উঠে যাচ্ছে আরও। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে এখন শিরিন। একশো ফুট ওপর থেকে

একটার পর একটা পাথর ফেলছে মো আ নিচের দিকে। ছোট বড় নানান আকৃতির পাথর। পাথরের আঘাত থেকে বাঁচতে গিয়ে দেরি হচ্ছে সিকুবা আ-র।

'মো আ! মো আ!' হাঁক ছাড়ছে সিকুবা আ। 'ভয় না আছে, তোর ভয় না আছে, মো আ! মার্মা'আছিস তুই, তোকে না মারব।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। যেখানে যত আলগা পাথর পাচ্ছে, ছুঁড়ছে মো আ নিচের দিকে।

বেশিক্ষণ এইভাবে ঠেকানো গেল না সিকুবা আ-কে। এঁকেবেঁকে পাথর বাঁচিয়ে উঠে এল সে মো আ-র কাছে। কিন্তু মো আ-কে ছাড়িয়ে উপরে উঠতে গিয়ে পড়ল আরেক অসুবিধায়। একটা জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়, ঠিক তারই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মো আ। সিকুবা আ উঠে যাওয়ার চেষ্টা করলেই পা ধরে টান দেয়, হড় হড় করে নেমে আসে দৈত্যটা আবার। পর পর কয়েকবার ওপরে ওঠার চেষ্টা করে বিফল হয়ে পুরো একটা মিনিট চিন্তা করল সিকুবা আ, কি করা যায়। অপরিপক্ক হলেও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি খেলল মাথায়। পরনের ছোট্ট কাপড়টা ফড়ফড় করে ছিড়ে হাত-পা বেঁধে ফেলল সে মো আ-র, মাথা উঁচু করে দেখল রানা ও শিরিনকে, তারপর সড়সড় করে উঠতে শুরু করল কুঠার হাতে।

পা ফসকে গেল শিরিনের, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল পাথরের ওপর। হাত ধরে টান দিল রানা উঠতে সাহায্য করবে বলে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল শিরিন, 'পারব না, আমি পারব না।'

'পারতেই হবে, শিরিন। পারতেই হবে!' জোর করে টেনে তুলল ওকে রানা। টেনে নিয়ে চলল সামনে। নিজেও হাঁপাচ্ছে সে মুখ হাঁ করে।

দ্রুত বেগে উঠে আসছে সিকুবা আ। ছুটতে ছুটতে ভাবছে রানা। আর কোন পথ খোলা নেই এখন—হয় মরা, নয় মারা। যুঝতে হবে ওর দানবের সঙ্গে, লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ শত্রুর সঙ্গে যেভাবে যুঝত, সেই ভাবে।

খালি হাতে।

তেরো

আরও দুশো ফুট বাকি এখনও। আর শক্তি নেই, পা দুটো থর থর করে কাঁপছে রানার।

তিনশো ফুট নিচে সিকুবা আ। মো আ-কে বেঁধে রেখে উঠে আসছে কুঠার হাতে।

শুয়ে পড়েছে শিরিন। শুয়ে পড়বারই কথা। তর্ক-বিতর্কে লাভ নেই। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল রানা ওকে।

দৌড়, দৌড়, দৌড়…

দূরত্ব কমছে, কমছে, কমছে…

রানা ভাবছে, এগারোটা গুহামুখ। একটি দিয়ে ঢোকা যায় রুবিমন্দিরের উপত্যকায়। বাকিগুলো গোলক ধাঁধা। কি রকম গোলক ধাঁধা? ওর একটায় ঢুকে পড়লে কেমন হয়? গোলক ধাঁধায় হারিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হবে না তো? যদি তাই হয় তবু সেটা সিকুবা আ-র কুঠারের ঘায়ে মরার চেয়ে ভাল হবে। পিছু ধাওয়া করে নিশ্চয়ই সিকুবা আ-ও ঢুকবে সেখানে। আর ঢুকলে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না তার পক্ষেও।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দূরত্ব কমে একশো ফিট হয়েছে। রানা এক গজ, সিকুবা দুই গজ—এই হারে ছুটছে ওরা।

বেরুনো কি সম্ভব হবে? ধরে ফেলবে না তো সিকুবা আ? মো আ-র বুদ্ধিটা কাজে লাগালে কেমন হয়? পাথর ফেলবে সে গোটা কয়েক? নাহ্। মো আ-র মাথায় পড়তে পারে। সে রাস্তা বন্ধ। টন টন করছে পা দুটো। মাথার ভিতর ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। মনে হচ্ছে বুক ফেটে বেরিয়ে যাবে কলজেটা। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো কোটর ছেড়ে। শিরিনকে মনে হচ্ছে দশ গুণ ভারী।

গতি শ্লথ হয়ে পড়ছে রানার। সিকুবা ছুটে আসছে। একটা হাত লট্‌কে আছে কাঁধের সঙ্গে, আরেক হাতে কুঠার। হাসি হাসি মুখে গানের সুর। মরণ সঙ্গীত। যেন লুকোচুরি খেলায় মেতেছে, রানাকে ছুঁতে চায়। ছুঁলেই মৃত্যু!

আর মাত্র পঞ্চাশ ফিট। হুইসলে ফুঁ দিতেই আবার বাধা দিতে শুরু করল গুণ্ডা সিকুবা আ-কে। একটু বিশ্রাম নিয়ে জোর ফিরে পেল রানা। ক্ষীণ একটা আশার আলো দেখল। ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে।

'আমাকে নামাও!' শিরিন বলল, 'পারব আমি!'

নামিয়ে দিল রানা। হাতটা ছাড়ল না শিরিনের। ছুটল দু'জন। 'কেঁউ' করে উঠল গুণ্ডা। তবে কি মারা পড়ল? ফিরে চাইবার সময় নেই।

গুহামুখে পৌঁছে গেল ওরা। মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে সিকুবা আ। গুণ্ডার গর্জন কানে এল রানার। পেছন ফিরে দেখল তিন পায়ে ভর দিয়ে দৌড়োচ্ছে গুণ্ডা। আঘাত পেয়েছে একটা পায়ে, ভাঁজ করে তুলে রেখেছে সেটা। একবার এদিক একবার ওদিক দৌড়ে আটকাবার চেষ্টা করছে সে সিকুবা আ-কে ঠিক যেমন ভাবে আটকে ছিল বাঘটাকে। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল রানার প্রভুভক্তির প্রাবল্য দেখে, মনটা ভরে উঠল কৃতজ্ঞতায়।

তীর বেগে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ধাক্কা দিতেই গড়িয়ে সরে গেল সাত নম্বর গুহামুখের পাথরটা। কিন্তু সেই পথে না ঢুকে শিরিনকে নিয়ে দৌড়ে চলে এল সে তৃতীয় গুহামুখের কাছে। খোলাই ছিল সেটা, ঢুকে পড়ল ভিতরে।

এই গুহার ভিতর লুকাবার জায়গা পাওয়া যাবে, ধরেই নিয়েছে রানা। মর্গান লুকিয়েছিল এই গুহায়, খুঁজে পায়নি ওকে রড়ি শামানের দল। এমনও তো হতে পারে…।

দপ্ করে নিভে গেল রানার সমস্ত আশা ভরসা।

মাত্র বিশ পঁচিশ গজ এগিয়েই হকচকিয়ে থেমে গেল সে। চারদিকে

তাকিয়ে দেখল পথ নেই, ফাঁক নেই, সুড়ঙ্গ নেই, তিনদিকেই দেয়াল—আটকা পড়ে গেছে ওরা। এখানে সেখানে পিঠ উঁচু হয়ে আছে দেয়ালের। দেয়াল-আলমারির মত গর্তও দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে। লুকোনো চলে। কিন্তু সিকুবা আ বোকা হলেও, এখানে থেকে খুঁজে বের করতে না-পারার মত বোকা নয়।

হঠাৎ চোখে পড়ল ফাঁকটা। বাঁ পাশে একটাই দেয়াল মনে হচ্ছিল—আসলে ওখানে দুটো দেয়াল। দুই দেয়ালের মাঝখানে সরু একটা ফাঁকের আভাস পেয়ে ছুটল সেদিকে। ঠিক শহরে বোমা পড়ার ভয় থাকলে বড় বড় দালানের সিঁড়ি মুখে যেমন আগে-পিছনে দুটো দেয়াল গেঁথে ব্যাফ্‌ল-ওয়াল বানানো হয়, বামদিকের দেয়াল দুটো ঠিক তেমনি—হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটাই দেয়াল। ফাঁক গলে ওপাশে চলে গেল ওরা।

গুহার বাইরে সিকুবা আ-র পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে আবার ছুটল রানা। কিন্তু আবার থমকে দাঁড়াতে হলো বিশ-পঁচিশ গজ এগিয়েই। এবার? বিশাল একটা হলরুমের মত জায়গায় চলে এসেছে ওরা। মাথার ওপর বেশ কিছুদূর পর্যন্ত পাথরের ছাদ, বাকি অর্ধেকটা শূন্য, ছাদ নেই! কোনদিকেই আর কোন রাস্তা দেখতে না-পেয়ে খোলা অংশের শেষ প্রান্তে চলে এল রানা। দেখতে পেল, প্রায় একহাজার ফুট নিচে দিক্‌চিহ্নহীন একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে। কি একটা জিনিস খুবই পরিচিত মনে হলো রানার। হঠাৎ মনে পড়ল এই সেই লাল নুড়ি পাথরের মাঠ?

দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল রানা। কোন উপায় নেই। আটকা পড়ে গেছে ওরা।

খাড়া নেমে গেছে পাহাড়। মাথার ওপর আকাশ। ব্যালকনির মত ফাঁকা জায়গাটার দু'পাশে পাহাড়ের মসৃণ গা খাড়া উঠে গেছে দেয়ালের মত। তাহলে? মর্গান লুকিয়েছিল কোথায়? একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল রানা। নিচে তাকাতেই দেখল মাত্র তিন হাত নিচে দুই হাত চওড়া একটা কার্নিস মত জায়গা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের ভিতর থেকে। সেই কার্নিস থেকে প্রায় খাড়া নেমে গেছে একটা কাঠের মই। মইটা শেষ হয়েছে বিশ হাত নিচে আর একটা দু'হাত চওড়া কার্নিসে। তার নিচে কি আছে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে একটা মইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যেন।

কে কবে কেন এই মই লাগিয়েছিল এখানে, বুঝতে পারল না রানা, কিন্তু একটা দুরাশা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে ওর। তবে কি এইভাবে একের পর এক মই লাগিয়ে ওঠা নামার একটা বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে? নামতে শুরু করলে কি ওরা হাজার ফুট নিচের ওই লাল নুড়ির মাঠে গিয়ে পৌঁছতে পারবে?

তিন সেকেন্ডে অনেক কিছু ভেবে নিল রানা। একেবারে মাঠে গিয়ে নামা যাক বা না যাক, বিশ হাত নিচের ওই কার্নিসে নেমে যেতে পারলে যে সিকুবা আ-র হাত থেকে বেঁচে যাবে ওরা এ যাত্রা, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। দশটা সিকুবা আ এলেও ওদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মই বেয়ে নেমে,

মইটা সরিয়ে নিলেই হবে। লাফ দিয়েই যদি পড়ে সিকুবা—ঠিক আছে, ওর মৃত্যুর জন্যে রানা দায়ী থাকবে না।

মই প্রস্তুতকারীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে অত্যন্ত সাবধানে তিন হাত নিচের অপ্রশস্ত কার্নিসে নামল রানা। নিচের দিকে চাইলে মাথাটা ঘুরে উঠতে চায়। পা ফসকালে হয় বিশ হাত নিচের কার্নিসে নয় পাহাড়ের গায়ে কয়েক ঠোকর খেয়ে একেবারে এক হাজার ফিট নিচে, মাঠের ওপর। কোনটাই কাম্য নয়।

বসল রানা। নামার আগে মইয়ের শক্তি পরীক্ষা করে নেয়া দরকার। কবেকার তৈরি কে জানে?

মইয়ের কাঠ ধরে নাড়া দিতে গিয়েই মুখটা কালো হয়ে গেল রানার। গুঁড়ো পাউডার হয়ে গেছে মুঠোর ভিতর মইয়ের কাঠ। এই রকম একটা মুহূর্তে নিয়তির এমন নির্মম পরিহাসের শিকার হবে কল্পনাও করেনি রানা। শিরিনের ডাকে সংবিৎ ফিরল।

'রানা।'

দাঁড়াল রানা। 'লুকিয়ে পড়ো, ওই ওদিকে, বড় পাথরটার আড়ালে! এক্ষুণি এসে পড়বে সিকুবা, যাও!'

'আর তুমি?'

'আমি থাকব এখানে। দুজন দু'দিকে। যাও!' যা-তা বলে বুঝ দেয়ার চেষ্টা করল শিরিনকে। ভেবেচিন্তে কথা বলবার সময় নেই এখন। বলল, 'সিকুবা এদিকে আসবে আমার খোঁজে, এলেই তুমি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটবে। মন্দিরের কাছে পিস্তল আছে, রাইফেল আছে—যাও।'

'না...'

'খুন করে ফেলব! যাও! যাও! শিরিন, যাও!'

রানাকে উন্মাদের মত আচরণ করতে দেখে ভয় পেল শিরিন। পিছিয়ে গেল সে। সিকুবা আ-র পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে লুকোল পাথরের আড়ালে।

সরু কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। মাথাটা শুধু দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে চোরাবালিতে ডুবে আছে সে বুক পর্যন্ত কিংবা দাঁড়িয়ে আছে কবরের মধ্যে। পাথরের আড়াল থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শিরিন রানাকে। একেবারে কাছে চলে এসেছে সিকুবা আ, ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছে পায়ের। মাথাটা নিচু করছে না কেন রানা?—ভাবল শিরিন—হলঘরে ঢুকেই তো দেখতে পাবে সিকুবা আ।

'এ্যাই, রানা!' চাপা গলায় ডাকল শিরিন। 'মাথা নামাও! দেখে ফেলবে!'

রানার যে হাসিটা পাগল করেছিল ওকে, যে হাসি দেখে আরও কিছুদিন স্মৃতিভ্রষ্টা থেকে ওর সঙ্গ উপভোগ করবার সাধ জেগেছিল মনে, সেই হাসিটা দেখতে পেল শিরিন ওর ঠোঁটে। হাসছে রানা। টাটা করবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, কিন্তু মাথাটা নামিয়ে নিল না। ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চুপ করতে বলল ওকে।

ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শিরিন, এসে গেছে

সিকুবা আ। যমদূত! রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাম হাত, ডান হাতে রক্তাক্ত কুঠার, পা দুটো শুওর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত।

মুহূর্তে বুঝে ফেলল শিরিন রানার উদ্দেশ্য। ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে যাচ্ছে রানা! কোন সন্দেহ নেই তাতে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে, যাতে এখানে পৌঁছে প্রথমেই দেখতে পায় সিকুবা আ ওকে। রানাকে দেখলে শিরিনকে না খুঁজে ওর দিকেই এগোবে সে প্রথমে। ফলে শিরিন সুযোগ পাবে পালাবার। মন্দিরের কথা বলে দিয়েছে রানা। শিরিনকে সিকুবা আ খোঁজাখুঁজি করবে আশপাশেই, কল্পনাও করতে পারবে না আবার পবিত্র মন্দিরে নামতে পারে শিরিন। কাজেই সময় পাচ্ছে সে যথেষ্ট, মো আ-কে মুক্ত করে মন্দিরে গিয়ে বসে থাকবে রাইফেল নিয়ে। সিকুবাকে শেষ করে ঘোড়ায় চড়ে মো আ-র সাহায্যে নির্বিবাদে পৌঁছে যেতে পারবে রামু, সেখান থেকে কক্সবাজার, সেখান থেকে ঢাকা—নিরাপত্তা!

বাহ্! মলিন হাসি ফুটে উঠল শিরিনের ঠোঁটে। নিজে মৃত্যুবরণ করছে ঠিকই, কিন্তু বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে লোকটা তাকে। কেমন লোক! ওর কথামত এগোলে সত্যিই প্রাণের ভয় নেই শিরিনের। এখুনি যদি হেঁটে বেরিয়ে যায় গুহা থেকে, টেরও পাবে না সিকুবা আ। সবই ঠিক, শুধু একটা হিসেব ভুল হয়েছে রানার। মৃদু হেসে সিদ্ধান্ত নিল শিরিন: যদি মরি, একসঙ্গে মরব। তোমার মহত্ত্বকে অ:জ্ঞা করছি না, বরং আজ তোমাকে মনের মধ্যে এমন এক আসনে বসিয়ে দিলাম যেখানে আর কারও স্থান হবে না কোন দিন—কিন্তু মাফ করো, তোমার প্রাণের বিনিময়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারব না আমি। তার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।

কিনারা থেকে ঠিক পাঁচ হাত দূরে এসে দাঁড়াল সিকুবা আ। রানার চোখের দিকে চেয়ে আছে সে, মুখে বীভৎস সেই সার্বক্ষণিক হাসি। আবার নাচতে শুরু করল সে।

'থামো, সিকুবা! একটা কথা শোনো…' সিকুবা আ-র মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখবার জন্যে কথা শুরু করল রানা, কিন্তু এগোতে পারল না। বুঝতে পারল, কোন কথা কানে ঢুকছে না ওর, ধুপধাপ পা ফেলে শরীর দুলিয়ে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে গেছে সিকুবা আ।

সেই নাচ। নাচতে নাচতে শরীর বাঁকিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে দিল হাতের কুঠার নীল আকাশের দিকে। সাথে সাথেই দ্বিগুণ হয়ে গেল নাচের ছন্দ। নাচতে নাচতে ডিগবাজি খাচ্ছে সামনে-পিছনে, হেলে পড়ছে ডাইনে-বাঁয়ে। রানা মনে মনে বলছে, শিরিন পালাও, শিরিন পালাও, পালাও, পালাও…

সিকুবা আ নাচছে। কুঠারটা নেমে আসছে দ্রুতবেগে, খেয়ালই নেই সেদিকে। কিন্তু রানা জানে, সময়ের হিসেব ঠিকই আছে ওর, ঠিক সময় মত শুয়ে পড়বে সে মাটিতে।

হলোও তাই। কুঠারটা যখন মাত্র বিশ-পঁচিশ হাত ওপরে, নেমে আসছে বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে, সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সিকুবা আ। সঙ্গে সঙ্গেই মুঠো ভর্তি কাঠের গুঁড়ো ছুঁড়ে দিল রানা ওর চোখ লক্ষ্য করে।

চোখে কাঠের গুঁড়ো পড়ায় লাফ দিয়ে উঠে বসল সিকুবা আ. পরমুহূর্তে কুঠারের কথা মনে হতেই ঝপ্ করে শুয়ে পড়ল আবার। এক লাফে উঠে এল রানা কার্নিস থেকে। একটা পা চেপে ধরে হড়হড় করে টেনে সরিয়ে দিল সিকুবা আ-কে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়ার জন্যে।

চোখ বুজে ডানহাত শূন্যে তুলেছিল সিকুবা আ. কুঠার এসে পড়ল বামহাতের কব্জীর উপর। মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কব্জী থেকে পাঁচ আঙুলসহ হাতটা। আঙুলগুলো নড়ছে আপনা আপনি।

কল কল করে রক্ত বেরোচ্ছে সিকুবা আ-র কব্জী থেকে। সেই অবস্থায় উঠে বসে অন্ধের মত ডান হাত দিয়ে হাতড়ে তুলে নিল সে কুঠারটা। অস্ত্র হাতে পেয়েই উঠে দাঁড়াল বুক ফুলিয়ে। চোখ মিট মিট করছে, ভালমত দেখতে পাচ্ছে না চোখে।

সুযোগটা নিল রানা। ছুটে গিয়ে কারাতে কিক্ মারল সিকুবার বুকে। দুই পা পিছিয়ে গেল সিকুবা আ। রানার অবস্থান আঁচ করে কোপ দেয়ার ভঙ্গিতে চালাল কুঠার। রানার নাকের কাছ দিয়ে বোঁ করে ঘুরে চলে গেল কুঠারের ক্ষুরধার ফলা। একলাফে পেছনে সরে গেল রানা।

রানার পায়ের শব্দ পেয়ে দুই পা এগিয়ে এল সিকুবা আ। আন্দাজের ওপর নির্ভর করে আবার একটা কোপ মারল। চোখে দেখতে পাচ্ছে না বলে শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যবহার করছে সে, সামান্যতম শব্দও এড়াচ্ছে না তার কান। পা টিপে সরে গেল রানা বাম পাশে। আশ্চর্য! বামদিকে ঘুরে দাঁড়াল সিকুবা আ। অপরাজেয় একটা ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক শক্তি বলে মনে হচ্ছে ওকে রানার।

সিকুবার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। পানিতে ধুয়ে সরে যাচ্ছে কাঠের গুঁড়ো। আর খানিক বাদেই সে পরিষ্কার দেখতে পাবে রানাকে, এবং দেখামাত্রই ছুঁড়বে কুঠার। যা করবার এখুনি করতে হবে, বুঝল রানা। ঝুঁকি যদি নিতে হয় তাও সই।

বামদিকটা দুর্বল সিকুবার। সেটা জানে বলেই বাম পা-টা সামনে বাড়িয়ে রেখেছে সে, শরীরের ওজন ডান পায়ে। হাতের কব্জী থেকে রক্ত ঝরে আলপনা আঁকছে পাথরের মেঝেতে। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বোঝার চেষ্টা করছে রানার গতিবিধি।

সরতে শুরু করল রানা। সিকুবাও।

যেদিকে দেয়াল নেই, খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা হাজার ফিট নিচে, সেইদিকে সরিয়ে আনতে চায় রানা ওকে। কিন্তু এর ফলে সিকুবার চেয়ে ওর নিজের বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। কিনারে না গিয়ে কিনারে আনতে পারছে না সে সিকুবাকে। কোনভাবে বেকায়দামত একটা ধাক্কা খেলে নিচে পড়ে যাবে রানা নিজেই।

হুইসলটায় ফুঁ দিল রানা। গুণ্ডার সাহায্য দরকার।

ডাক শুনেই ছুটে এল গুণ্ডা, কিন্তু ওর দিকে এক নজর চেয়েই বুঝতে পারল রানা, সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই আর বেচারির। জোর আঘাত পেয়েছে সে পায়ে, খুঁড়িয়ে হাঁটছে, ব্যথায় কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে ওর

শরীরটা।

বিপদ টের পেয়ে ছোটখাট একটা হুঙ্কার ছাড়ল গুণ্ডা। সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে পেছন ফিরল সিকুবা আ। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেঁটে গেল রানা ওর পিঠের সাথে। বিশাল দৈত্যকে জুডোর কৌশলে শূন্যে তুলে আছাড় মারল রানা ঠিকই, কিন্তু রক্ত-পিচ্ছিল মেঝেতে বাম পা-টা পিছলে গেল বলে পড়ে গেল সে নিজেও।

আছাড় খেয়ে পাগলের মত বন বন করে নিজের চারপাশে কুঠার ঘোরাল সিকুবা আ। নাগালের মধ্যেই শুয়ে আছে রানা মেঝেতে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। শুয়ে শুয়েই খটাং করে লাথি লাগিয়ে দিল রানা ওর ডান হাতের কনুইয়ে। স্টীলের পাত বসানো জুতোর লাথিটা জায়গামত পড়তেই ছিটকে বাইরে চলে গেল কুঠারটা, পতনের শব্দ পাওয়া গেল না।

কুঠার পতনের শব্দ না পেয়ে সিকুবা ভাবল, সেটা বুঝি রানার হাতে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এই বুঝি ঘ্যাচ করে বিঁধবে এসে কুঠারের ফলা—হয় বুকে, নয় ঘাড়ে।

উঠে বসল রানা। শব্দ পেয়েই তড়াক করে এক লাফে পিছিয়ে গেল সিকুবা। একেবারে কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে নিজের অজান্তেই।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলে এক হাতেই পিটিয়ে খুন করে ফেলবে সিকুবা ওকে আর শিরিনকে, কাজেই সময় থাকতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করল রানা। লাফ দিয়ে উঠে গেল সে শূন্যে।

দড়াম করে আরেকটা লাথি খেল সিকুবা আ বুকের ওপর। পিছিয়ে যেতে যেতে রানার একটা পা ধরে ফেলবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ফস্‌কে গেল হাত।

ফস্‌কে গেল পা-ও। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল বিশাল দেহটা চোখের সামনে থেকে। ভয়ার্ত একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে আওয়াজটা।

কিনারে এসে দাঁড়াল রানা। উঁকি দিল নিচের দিকে। প্রথম বা দ্বিতীয় কার্নিসে পড়েনি সিকুবা। কোথাও এখনও পড়েনি সে। এখনও নামছে। ছোট, ক্রমশ আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে তার শরীরটা যতই নিচে নামছে।

চোদ্দ

গুণ্ডাকে নিয়ে মুশকিল হলো। তিন নম্বর গুহা থেকে বেরিয়ে আর ছ'নম্বরে ঢুকতে চাইছে না কিছুতেই। মো আ-কে বাঁধন খুলে নিয়ে আসতে হবে ওপরে, কিন্তু কিছুতেই এগোতে দিতে চাইছে না সে। পথরোধ করে ঘেউ ঘেউ করছে অবিরাম।

আবার কি ভূমিকম্প হবে? কেমন যেন থম থম করছে চারদিক।

ছয় নম্বর গুহাপথ ধরে ছুটল রানা। পেছনে পেছনে শিরিন। গুহার শেষ

প্রান্তে দাঁড়াল ওরা।

নিঝুম, নিস্তব্ধ আটশো ফুট নিচের উপত্যকাটা। শুধু ঘোড়াগুলো···

'ও কি!'

শিরিন চেঁচিয়ে উঠল। ঘোড়াগুলো দড়ি ছিঁড়ে নিজেদেরকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে। এক সাথে পাগল হয়ে গেছে যেন সব কটা।

নামতে শুরু করল রানা নিচের দিকে। মো আ দুই হাত তুলে কিছু বলছে। হাত নাড়া দেখে মনে হচ্ছে, নিষেধ করছে সে রানাকে নামতে। থামতে বলছে। সাতশো ফুট নিচে সে, শোনা যাচ্ছে না তার একটা কথাও।

ছুটছে গুণ্ডাও। প্রাণপণে চেষ্টা করছে সে রানাকে ছাড়িয়ে সামনে যেতে, রানার পথে বাধা হয়ে রুখে দাঁড়াতে।

মো আ নিষেধ করছে রানাকে, হাত নেড়ে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। পায়ের নিচে দুলে উঠল পাহাড়টা। কাঁপছে থরথর করে, অনুভব করল ও।

ভারী, গম্ভীর ধরনের আওয়াজ শুনে তাকাল সে থাম্পা মন্দিরের দিকে। মন্দিরের দু'পাশে হেলে থাকা পাহাড় দুটো দুদিক থেকে নেমে আসছে বলে মনে হলো ওর। দৃষ্টিভ্রম নয়তো? চোখ কচলে নিয়ে আবার দেখল, সত্যিই ভেঙে পড়ছে দুপাশের পাহাড়।

প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে গেল রানার। অদৃশ্য হয়ে গেল পবিত্র মন্দির লাল পাহাড়—সব।

স্তম্ভিত, আতঙ্কিত রানার সংবিৎ ফিরল গুণ্ডা ওর প্যান্ট কামড়ে ধরে প্রাণপণে টানতে শুরু করায়। পিছিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে গুণ্ডা রানাকে।

মো আ-র দিকে চেয়ে আছে রানা। হাত নাড়ছে বুড়ি। নিষেধ করার ভঙ্গিতে নয় এখন, বিদায় জানাবার ভঙ্গিতে। হাসছে বুড়ি। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল রানার। তীব্র এক ঝাঁকুনি খেয়ে পড়ে গেল সে। দুলছে গোটা দুনিয়াটা। উঠে বসতে বসতে দেখল মো আ নেই, সেই জায়গায় মস্ত এক ফাটল। দমাদম বিরাট সব পাথরের চাঁই নামছে ওপর থেকে।

নেমে আসছিল শিরিন, রানাকে উঠে যেতে দেখে থামল। পায়ের নিচে পাথর স্থির নয়, বারবার আছাড় খাচ্ছে রানা। উঠে আসছে মাতালের মত টলতে টলতে।

ওপরে উঠেই শিরিনের হাত ধরে ছুটল রানা গুহামুখের দিকে। দশ গজ এগিয়েই পিছনে চড়াৎ শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সে। ঠিক যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল শিরিন, সেখানটায় বিরাট এক গহ্বর দেখা যাচ্ছে এখন। যেখানে খুশি সেখানেই ফাটল দেখা দিতে পারে এখন—প্রাণপণে ছুটল ওরা। গুহামুখ থেকে বেরিয়ে উপত্যকার মাঝামাঝি নিরাপদ জায়গায় পৌছবার আগে থামল না।

ভূমিকম্প থামল দশ মিনিটেই, তারও আধঘণ্টা পর থামল পাহাড়-ধস আর পতনের শব্দ।

যে পবিত্র মন্দিরকে নিয়ে এত যুগের এত নাটক, তার শেষ দৃশ্যে তুমুল

অভিনয় করল স্বয়ং প্রকৃতি। এবার যবনিকাপাত।

'ফিরব কি করে, রানা?'

'তাই তো ভাবছি।'

'কালকের ওই সামান্য ভূমিকম্পেই গিরিপথের যা অবস্থা দেখেছি! আজ যে কি হয়েছে কল্পনা করতেও ভয় লাগছে। আটকা পড়ে গেছি আমরা, রানা?'

'হুম।'

'হুম, মানে? সঙ্গে খাবার নেই, পানি নেই, ঘোড়া নেই—কি হবে আমাদের, রানা?'

'শেষ পর্যন্ত মরতে হবে,' বলল রানা। নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানছে সে।

'ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা নয়, শিরিন। শেষ পর্যন্ত তোমার, আমার, সবার ওই একই গতি—মরতে হবে।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু সেই শেষটা কি এসে গেল আমাদের?'

'আরে না। তিরিশ-চল্লিশ বছর দেরি আছে এখনও।'

'কিন্তু ফিরবে কোন্ পথে?'

'আকাশ পথে।'

'আবার ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা নয়, শিরিন। হেলিকপ্টার আসছে আমাদের জন্যে।'

'হেলিকপ্টার! কোত্থেকে?'

'চট্টগ্রাম থেকে। অর্ধেক পথ হয়তো এসে গেছে এতক্ষণে।'

'কি করে জানল তারা যে আমরা বিপদে পড়েছি? কোথায় আছি তাই বা জানবে কি করে?'

'জানাবার ব্যবস্থা করেছি আমি কাল রাতেই। আজ সকালে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। দেখা যাক দেরি হচ্ছে কেন।'

জুতোর সোলের মধ্যে একটা ওয়াটার-টাইট কম্পার্টমেন্ট থেকে ছোট্ট একটা যন্ত্র বের করল রানা। একটা বোতাম ধরে টান দিতেই দু'হাত লম্বা এরিয়েল হয়ে গেল সেটা। ডায়াল ঘুরিয়ে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল সে।

'এটা কি অয়্যারলেস সেট? কোথায় পেলে?'

'বরাবর সঙ্গেই ছিল।'

'আগে ব্যবহার করোনি কেন এটা?'

'করেছি। দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় সরাসরি হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না, সেইজন্যেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম জামানকে। ওর মাধ্যমে সেই দিন থেকেই নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি আমি ঢাকার সঙ্গে।'

'আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেনি কেন তারা?'

'উদ্ধার পেতে তো চাইনি। চাইলেই করত। আমি দেখতে চেয়েছিলাম সত্যিই থাম্পা মন্দিরে কোটি কোটি টাকার রুবি আছে কিনা?'

'সত্যিই তো ছিল,' বলল শিরিন। 'একাই সবটা নিয়ে নিতে চেয়েছিল

মিরহাম। আচ্ছা, তুমি ভাগ নিতে অস্বীকার করেছিলে কেন?'

'সবটা নেব মনে করে।'

'এত টাকার রুবি দিয়ে কি করতে?'

'সুন্দর দেখে একটা বেছে তোমাকে দিতাম। বাকি সব তুলে দিতাম বাংলাদেশ সরকারের হাতে। লুট হয়ে যেতে দিতাম না কিছুতেই।'

জামানের কণ্ঠস্বর ভেসে এল পরিষ্কার।

'কি অবস্থা, রানা? এত চেষ্টা করেও তোমাকে পাচ্ছি না কেন?'

'অবস্থা খুবই খারাপ। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি। এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম প্রাণ বাঁচানোর কাজে। সকালে হেলিকপ্টার আসার কথা ছিল, এল না কেন?'

'সেই খবর জানাবার জন্যেই তো সকাল থেকে চেষ্টা করছি যোগাযোগ করতে। তুমি যে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দিচ্ছ, সেটা ভারতে পড়ে যায়।'

'কিন্তু আমি তো বলেছি, এই জায়গা ভারত বর্মা নয়—বাংলাদেশ। এ ব্যাপারে আমি শিওর। বলোনি ওদের? ডিগ্রী আর মিনিটের হিসেবে আমার ভুল থাকতে পারে—আন্দাজের হিসেব। অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ নিয়ে অত মাথা ঘামাতে কে বলেছে ওদের? কাছাকাছি চলে এলে আমি মিনি অয়্যারলেসের সিগন্যাল পাঠিয়ে ঠিক জায়গায় নামাতাম। যাই হোক, আসেনি কেন?'

'তোমার ল্যাটিচুড-লঙ্গিচুড দেখে ভড়কে গেছে আসলে। শিওর হতে চেয়েছিল। ফারাক্কা-আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর হাওয়া এখন গরম। সীমান্ত হামলা চলেছে জোরেশোরে। এই অবস্থায় আমাদের হেলিকপ্টার ভারতের বর্ডার ক্রস করলে...' রানাকে জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করতে শুনে থেমে গেল জামান। একটু পরে বলল, 'অবস্থাটা সত্যিই ডেলিকেট, রানা। সেই জন্যে এলাকার বর্ণনা চাইছিল ওরা। কিন্তু সকাল থেকে এত চেষ্টা করেও...'

'ওদেরকে বলো, এলাকার বর্ণনা দিলেও চিনতে পারবে না ওরা। আধঘণ্টা আগে ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পে এলাকার জিয়োগ্রাফী পাল্টে গেছে। বিরাট সব পাহাড় ধসে গেছে।'

'আমাদের এখানেও টের পেয়েছি আমরা।' বলল জামান।

'তোমরা টের পেয়েছ, আমরা টেরটি পেয়েছি! যাই হোক, আমার বক্তব্য জানাও ওদের। যদি এরপরেও ক্ল্যারিফিকেশন কিছু চায়, সোজা মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার কথাগুলো বলবে। বেরোবার পথ আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে পাহাড় ধসে। সঙ্গে খাবার নেই, পানি নেই, অস্ত্র নেই। বেঁচে আছি শুধু আমি, শিরিন আর গুণ্ডা।'

'রুবিগুলো?'

'গোটা মন্দির এখন হাজার ফুট পাথরের নিচে।'

'মাই গড! তোমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছি, রানা। আমি এক্ষুণি কমিউনিকেট করছি। ওয়েট করো, এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে হেলিকপ্টার।'

'এক ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে।' শিরিনের চোখে চোখ রেখে হাসল রানা।

সেই পাগল-করা হাসি।

প্রত্যুত্তরে হাসল শিরিনও। হাত ধরে টানতেই চলে এল কাছে। লাল হয়ে উঠল গাল দুটো।

'লজ্জা করছে!'

'কাকে, শিরিন? আমাকে?'

'না। ওকে।' গুণ্ডার দিকে চাইল শিরিন। 'তাকিয়ে রয়েছে।'

মৃদু হেসে কোটটা খুলে ঢেকে দিল রানা গুণ্ডাকে।

মুহূর্তে নির্লজ্জ হয়ে উঠল শিরিন।